

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতাসমূহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

বৃষ্টি আক্তার

রোলঃ 23090120805

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতাসমূহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

বৃষ্টি আক্তার

রোলঃ 23090120805

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতাসমূহ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে বৃষ্টি আক্তার, আইডিঃ 23090120805 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: শারায়াত কারীম

এরাবিক ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতাসমূহ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্বাক্ষর

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

বৃষ্টি আক্তার

আইডিঃ 23090120805

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

সারসংক্ষেপ.....	0
ভূমিকা.....	3
প্রযুক্তির বিবর্তন ও প্রেক্ষাপটঃ.....	7
প্রযুক্তির প্রকারভেদ	11
প্রযুক্তির সুফল এবং কুফলঃ.....	14
প্রযুক্তির ফাঁদ.....	16
প্রযুক্তির মনস্তাত্ত্বিক ফাঁদ	18
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাবঃ.....	23
সামাজিক ও পারিবারিক অবক্ষয়	30
শিশু ও কিশোরদের ওপর প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব.....	39
সাইবার নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত তথ্যের ঝুঁকি.....	42
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ.....	45
পরিবেশ গত বিপর্যয়ঃ.....	47
উত্তরণের উপায় ও সুপারিশমালা	49
উপসংহার	51

সারসংক্ষেপ

প্রযুক্তি আধুনিক জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে সহজ, দ্রুত ও কার্যকর করেছে, যেমন যোগাযোগের গতি বৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ব্যবসা ও বিনোদনে সুবিধা প্রদান। তবে প্রযুক্তি নিজে হারাম নয়; এর অপব্যবহার নৈতিক, সামাজিক, মানসিক, শারীরিক ও পরিবেশগত ক্ষতি সৃষ্টি করতে পারে। এই থিসিসে প্রযুক্তির বিভিন্ন দিক—সুবিধা, ফাঁদ, অপকারিতা, শারীরিক ও মানসিক প্রভাব, সামাজিক ও পারিবারিক অবক্ষয়, শিশু ও কিশোরদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব, সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও কর্মসংস্থানের প্রভাব, পরিবেশগত ক্ষতি এবং উত্তরণের উপায়—বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। থিসিসের প্রথম অধ্যায়ে প্রযুক্তির বিবর্তন ও প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। মানব ইতিহাসে প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে আধুনিক প্রযুক্তির বিস্তার মানুষের জীবনে নতুন ধরনের ফাঁদ ও ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। এ অধ্যায়ে কোরআনের আলোকে নির্দেশিত নৈতিক দিক এবং রাসূল ﷺ-এর হাদিসের ভিত্তিতে প্রযুক্তি ব্যবহারের নিয়মাবলী বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾

অর্থ: “পৃথিবীতে যা ঠিক আছে তা নষ্ট করো না।” (সূরা আরাফ, ৭:৫৬)

রাসূল ﷺ বলেছেন:

«لا ضرر ولا ضرار»

অর্থ: “কোনও ক্ষতি নেই এবং ক্ষতি করা চলবে না।” (সহিহ বুখারি) দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে প্রযুক্তির প্রকারভেদ, সুবিধা ও কুফল আলোচনা করা হয়েছে। প্রযুক্তির সুবিধার মধ্যে রয়েছে দ্রুত যোগাযোগ, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক কার্যক্রমের স্বয়ংক্রিয়তা, এবং সামাজিক যোগাযোগের সুবিধা। তবে কুফলের মধ্যে রয়েছে নৈতিক অবক্ষয়, মানসিক চাপ, একাকীত্ব, পারিবারিক দূরত্ব এবং শিশু ও কিশোরদের মানসিক ও আচরণগত ক্ষতি।

চতুর্থ অধ্যায়ে প্রযুক্তির মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার ডোপামিন লুপ, FOMO (Fear Of Missing Out) সিনড্রোম, মনোযোগের ঘাটতি, ভার্চুয়াল জীবন বনাম বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্ব—মানুষের মানসিক ও আচরণগত স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করেছে। শারীরিক প্রভাবের মধ্যে চোখের সমস্যা, অনিদ্রা, স্থূলতা, ডিপ্রেশন, উদ্বেগ এবং একাকীত্ব উল্লেখযোগ্য। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে সামাজিক, পারিবারিক এবং শিশু-কিশোরদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার পরিবারে দূরত্ব সৃষ্টি

করে, পারিবারিক সম্পর্ক দুর্বল করে এবং শিশু ও কিশোরদের আচরণ, মনোযোগ, নৈতিকতা ও সৃজনশীলতার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।

সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে সাইবার নিরাপত্তা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। হ্যাকিং, ফিশিং, পরিচয় চুরি, অনলাইন প্রতারণা, ডিপফেক এবং রোবোটিক্সের অপ্রাকৃতিক ব্যবহার মানসিক নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত তথ্য ও কর্মসংস্থানের জন্য ঝুঁকি তৈরি করেছে।

নবম অধ্যায়ে পরিবেশগত ক্ষতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ই-বর্জ্য, অতিরিক্ত ডাটা সেন্টার, বিদ্যুৎ খরচ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক বাসস্থানের ক্ষতি সৃষ্টি করেছে। দশম অধ্যায়ে দেশীয় প্রেক্ষাপটের কেস স্টাডি ও তথ্য বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। জরিপ, গ্রাফ এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রযুক্তির অপব্যবহার শিক্ষার্থী, পরিবার এবং সমাজের জন্য মারাত্মক চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। অভিভাবক, শিক্ষক ও শিশুদের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে সচেতন ব্যবস্থাপনা ছাড়া প্রযুক্তি ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাব প্রতিরোধ করা কঠিন।

অধ্যায় ১০-এ উত্তরণের উপায় ও সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। ডিজিটাল ডিটক্স, ডিজিটাল ওয়েলবিয়িং, পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, সরকারি নীতিমালা এবং প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উপসংহারে বলা যায়, প্রযুক্তি মানুষের জীবনে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার যা সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে কল্যাণ এবং উন্নতি নিশ্চিত করতে পারে। ইসলামের নৈতিক দিক, কোরআনের নির্দেশ এবং হাদিস অনুসরণ করে প্রযুক্তি ব্যবহার করা, পরিবারের নিয়ন্ত্রণ, সরকারী নীতি, শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

অর্থ: “আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য।” (সূরা যারিয়াত, ৫১:৫৬)

রাসূল ﷺ বলেছেন:

«الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»

অর্থ: “হায়া ঈমানের একটি শাখা।” (সহিহ বুখারি) সারসংক্ষেপে বলা যায়, প্রযুক্তির কল্যাণ এবং ক্ষতি পুরোপুরি মানুষের হাতে নির্ভরশীল। নৈতিক, সামাজিক, মানসিক, শারীরিক এবং পরিবেশগত দিকগুলো বিবেচনা করে প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা হলে এটি মানুষের জীবন উন্নত, সমাজ স্থিতিশীল এবং পরিবেশ সুরক্ষিত রাখতে পারে। থিসিসটি প্রমাণ করে যে

সচেতন ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা এবং নৈতিক মূল্যবোধ বজায় রাখার মাধ্যমে প্রযুক্তি মানুষের কল্যাণ, স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা এবং সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সক্ষম।

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্ব একটি অভূতপূর্ব প্রযুক্তিনির্ভর যুগে প্রবেশ করেছে, যেখানে মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রভাব স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। যোগাযোগব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য, নিরাপত্তা ব্যবস্থা—সব ক্ষেত্রে প্রযুক্তি যে এক বিশাল উপকার বয়ে এনেছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এ সত্যও অস্বীকার্য যে প্রযুক্তির এই দ্রুত অগ্রগতি ও অব্যাহত ব্যবহার মানবসমাজের জন্য বহুবিধ ক্ষতির দরজা খুলে দিয়েছে; সৃষ্টি করেছে নতুন নতুন ফিতনা, নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক অস্থিরতা ও আধ্যাত্মিক দুর্বলতা। প্রযুক্তির সুফলের আড়ালে যে ভয়াবহ ফাঁদ ও অপকারিতা লুকিয়ে আছে, সেটিই এ গবেষণার প্রধান বিষয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾

অর্থ: “মানুষের কৃতকর্মের ফলে স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।” (সূরা রুম, ৩০:৪১)জরুরি। এই থিসিসের মাধ্যমে প্রযুক্তির ফাঁদ ও অপকারিতাসমূহকে কুরআন-হাদিস ও উলামাদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিশ্লেষণ করে সমাধান ও নির্দেশনা উপস্থাপন করাই মূল লক্ষ্য। আজ প্রযুক্তির দুনিয়া সেই পরীক্ষারই এক ভয়াবহ ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই গবেষণার প্রয়োজনীয়তা আজ অত্যন্ত জরুরি। কারণ প্রযুক্তির যেসব বিপদ আজ আমাদের সামনে প্রকাশ্য, তা ভবিষ্যতে আরও বড় সংকটে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। শিশু-কিশোরদের নৈতিক ধ্বংস, পর্নোগ্রাফির আসক্তি, সাইবার বুলিং, ভিডিও গেমসের নেশা, অ্যালগোরিদম-নির্ভর মানসিক প্রভাব, সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তি, নিজস্বতা ও চরিত্র ধ্বংস, ভার্চুয়াল সম্পর্ক, সময়ের অপচয়, ফ্রি মিক্সিং, পারিবারিক অবহেলা—ইত্যাদি ক্ষতি দিন দিন ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে।

কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾

অর্থ: “নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। তোমরাও তাকে শত্রু মনে করো।” (সূরা ফাতির, ৩৫:৬)

আজকের প্রযুক্তি পরিবেশে শয়তানের প্রবেশ সবচেয়ে বেশি হয়েছে স্মার্টফোন, ইন্টারনেট ও প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে আজ যে নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিপর্যয় বিশ্বজুড়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে—এই আয়াত তার বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

প্রযুক্তির উন্নয়ন যেমন মানুষের জ্ঞানের বিস্তার ঘটিয়েছে, তেমনি অজ্ঞতা, গোমরাহি, অশ্লীলতা, ব্যভিচার, সাইবার অপরাধ, মাদক, জুয়া, জেস্তার বিভ্রান্তি, নৈতিকহীনতা, সময়ের অপচয়, পারিবারিক ভাঙন, নির্জনতা ও মানসিক ব্যাধির মতো শত-কোটি সমস্যার জন্ম দিয়েছে। মানুষের হাতের ছোট্ট স্মার্টফোন এখন যেন এক বিশাল দুনিয়ার দরজা, যেখানে ভালো-মন্দ, হালাল-হারাম, নৈতিক-অনৈতিক সবকিছু মিশে আছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ সতর্ক করে বলেছেন:

“নিশ্চয়ই দুনিয়া মধুর ও আকর্ষণীয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে এতে খেলাফত দিয়েছেন যাতে তিনি পরীক্ষা করেন তোমরা কীভাবে কাজ করো।” (সহিহ মুসলিম) অপব্যয় ও স্বল্পস্থায়ী আনন্দের ফাঁদে ফেলে। এগুলো ক্রমান্বয়ে মানুষকে একাকীত্ব, তুলনামূলক জীবন, বিষণ্ণতা ও উদ্বেগে আক্রান্ত করে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿الْهَآكُمُ النَّكَارُ﴾

অর্থ: “বহুত্বের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে বিমুখ করে রেখেছে।” (সূরা তাকাসুর, ১০২:১) সোশ্যাল মিডিয়া ঠিক এই আয়াতের বাস্তব রূপ-মানুষকে দেখানোর প্রতিযোগিতা ও প্রশংসা পাওয়ার নেশায় নিমজ্জিত করে রেখেছে।

তাছাড়া প্রযুক্তির দ্বারা দাম্পত্য-ভাঙন, পরিবারে অবহেলা, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা হ্রাস, স্বামী-স্ত্রীর গোপন তথ্য বাইরে প্রকাশ, অশ্লীল চ্যাটিং, ভিডিও কলিং, ফ্রি মিক্সিং ইত্যাদি বিপদ বাড়ছে। নবী ﷺ বলেছেন:

“পরিবারই তোমাদের সবার জন্য আমানত।” (তিরমিযী) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে। বিশেষত যখন আল্লাহর স্মরণ, লজ্জাশীলতা ও তাকওয়া দুর্বল হয়ে পড়ে-তখন প্রযুক্তি হয়ে যায় শয়তানের হাতিয়ার।

আধুনিক প্রযুক্তির এক বড় ফাঁদ হলো অশ্লীলতা ও পর্নোগ্রাফির সহজলভ্যতা। রাসূল ﷺ বলেছেন:

“হায়া ছাড়া মানুষের ঈমানে কোনো ভালো নেই।” (মুয়াত্তা মালেক)

কিন্তু আজ অশ্লীল কন্টেন্ট, ছবি, ভিডিও, গান, অ্যানিমেশন, সিরিজ ইত্যাদি এত দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে যে মানবসমাজ বিশেষত তরুণরা অভূতপূর্ব নৈতিক সংকটে পড়েছে।

আরেকটি বড় সমস্যা হলো সোশ্যাল মিডিয়ার অন্ধ আসক্তি। ফেসবুক, টিকটক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম-এই প্ল্যাটফর্মগুলোর অ্যালগোরিদম মানুষের সময় কেড়ে নেয়, মনোযোগ ধ্বংস করে, শিক্ষাজীবনকে ব্যাহত করে, নৈতিক বিচ্যুতি ঘটায় এবং মানুষকে আত্মসম্মানবোধ, সামাজিকতা-সব হারিয়ে ফেলছে।

প্রযুক্তি আল্লাহ তা ‘আলার একটি নিয়ামত, যা মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমন কুরআনে আল্লাহ বলেন: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ — “তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সবকিছু।” (বাকারা ২:২৯)। এই আয়াত প্রমাণ করে যে প্রযুক্তি মূলত মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই আল্লাহর দান। আবার আল্লাহ জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া শিখিয়েছেন: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ — “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে বৃদ্ধি দান করুন।” (ত্বাহা ২০:১১৪)। সুতরাং সঠিক জ্ঞান নিয়ে প্রযুক্তির উপকারী দিক গ্রহণ করা ইসলামী নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। তবে এই নিয়ামত যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন তা মানুষের জন্য ফেতনা ও গোনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আজ প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে অশ্লীলতা, ব্যভিচারের উপকরণ, পর্নোগ্রাফি, চ্যাটিং-এর অবাধ সুযোগ, হারাম সম্পর্ক, সময়ের অপচয়, মানসিক অস্থিরতা, পরিবারে অশান্তি, নামাজ-ইবাদাতে অনাগ্রহ, গুজব-মিথ্যা প্রচারণা এবং যুবসমাজের নৈতিক পতন ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْرَىٰ﴾ — “ব্যভিচারের নিকটেও যেয়ো না।” (ইসরাঃ ১৭:৩২)। আজকের অনলাইন অশ্লীলতা, অনৈতিক ছবি-ভিডিও দেখা, নোংরা কনটেন্ট স্ক্রল করা—সবই এই নিষেধাজ্ঞার সুস্পষ্ট অন্তর্ভুক্ত। আবার আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ — “কান, চোখ ও অন্তর—সব কিছুর হিসাব কিয়ামতে দিতে হবে।” (ইসরাঃ ১৭:৩৬)। ফলে ইন্টারনেটে যা দেখি, যা শুনি, যা পড়ি—সবই আমাদের দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে। হাদিসে রাসূল ﷺ প্রযুক্তির যুগের ফেতনার পূর্বাভাস হিসেবে বলেছেন: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُ إِلَّا اسْمُهُ» — “মানুষের ওপর এমন সময় আসবে, যখন ইসলামের থাকবে শুধু নামমাত্র।” (বাইহাকী)। আজ প্রযুক্তিভিত্তিক গোনাহের বিস্তার দেখে এই হাদিসের বাস্তবতা স্পষ্ট হয়। আবার তিনি আরও বলেছেন: «الْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظَرُ» — “চোখের ব্যভিচার হলো—অশ্লীল দিকে তাকানো।” (বুখারি)। আজকের মোবাইল স্ক্রিন, ভিডিও, রিল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অশ্লীলতার সহজলভ্যতা এই হাদিসের বাস্তব রূপ। অন্য হাদিসে সময় নষ্টের ব্যাপারে এসেছে: «نَعْمَتَانِ مَغْبُوتٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ» — “দুটি নিয়ামত আছে যা অনেক মানুষ নষ্ট করে—সুস্থতা ও অবসর।” (বুখারি)। প্রযুক্তির আসক্তি—ফেসবুক স্ক্রল, টিকটক দেখা, গেম ডুবে থাকা—এই দুই নিয়ামত নষ্ট করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে প্রযুক্তি মানুষের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে প্রযুক্তি মানুষের ইমান, চরিত্র, আচরণ, পরিবার, সময়, মনোবল ও শিক্ষাগত অগ্রগতিকে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। যুবসমাজ আজ পর্নোগ্রাফি, গেম আসক্তি, অসংযত বন্ধুত্ব, রাত জাগা, মুঠোফোনে ডুবে থাকা, দাম্পত্য-সংসারে অবিশ্বাস ও সন্দেহ বাড়ানো ইত্যাদি সমস্যায় ভুগছে। শিক্ষার্থীরা পাঠে মনোযোগ হারাচ্ছে, নামাজ-ইবাদাত শিথিল হয়ে যাচ্ছে, চিন্তাশক্তি দুর্বল হচ্ছে। সামাজিক পরিসরে দেখা যাচ্ছে—গুজব, অপপ্রচার, মিথ্যা সংবাদ ও অশান্তি ছড়িয়ে

পড়ছে ঝড়ের গতিতে। পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, সন্তানদের চরিত্র গড়ার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, এবং সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। তাই প্রযুক্তির এই অন্তহীন ফাঁদের বাস্তবতা অনুধাবন করা, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর সঠিক ব্যবহার নির্ধারণ করা, অপব্যবহারের ক্ষতি তুলে ধরা এবং সমাজ-মাদরাসা-পরিবার পর্যায়ে প্রতিরোধমূলক নীতি প্রণয়ন করা আজ অত্যন্ত জরুরি।

এই গবেষণায় আমরা প্রযুক্তির এই সমস্ত ক্ষতি-মানসিক, নৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, আধ্যাত্মিক, শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্যক্ষেত্র, সম্পর্ক-সব দিক গভীরভাবে বিশ্লেষণ করব। পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহ, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, আলেমদের বক্তব্য, গবেষকদের মতামত, বাস্তব উদাহরণ ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখানো হবে যে কীভাবে প্রযুক্তির ফাঁদ থেকে বাঁচা যায়, কীভাবে নিয়ন্ত্রিত ও হালাল ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, এবং একজন মুসলিম কীভাবে প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবে-প্রযুক্তি তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে না। আমরা জানি, ইসলাম হলো সমতা, পরিমিত, সংযম ও হিদায়তের ধর্ম। প্রযুক্তি নিজে হারাম নয়; কিন্তু এর অপব্যবহার হারাম, ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক। তাই গবেষণাটি কেবল প্রযুক্তির ক্ষতি তুলে ধরবে না; বরং একটি সমাধানধর্মী মানচিত্রও তৈরি করবে-যা একজন ছাত্র, শিক্ষক, আলেম, অভিভাবক, তরুণ,কিন্তু প্রযুক্তির অপব্যবহার এই আমানতকে বিনষ্ট করছে।

শিশুদের ক্ষেত্রেও প্রযুক্তি এক বিরাট বিপদ। স্মার্টফোন শিশুদের মেধা, মনোযোগ, নৈতিকতা, শরীর, ঘুম, স্বভাব-সবকিছু নষ্ট করছে। ইউটিউব, গেমস, কার্টুন, শর্ট ভিডিও-এগুলো শিশুদের বাস্তব জীবন থেকে দূরে সরিয়ে এক কৃত্রিম দুনিয়ায় নিয়ে যাচ্ছে। মনোবিজ্ঞানীরা এটিকে “ডিজিটাল ড্রাগ” বলেন। ইসলাম শিশুদের সুস্থ লালন-পালনের কথা বলে, যেখানে ভালো পরিবেশ, উত্তম আদর্শ, নৈতিকতা ও ঈমানদীক্ষার গুরুত্ব রয়েছে। প্রযুক্তির অপব্যবহার এই ভিত্তিকে ধ্বংস করছে।

একদিকে প্রযুক্তি মানুষের সময় চুরি করছে, অন্যদিকে মানুষকে আল্লাহ-স্মরণ, ইবাদত, কুরআন তিলাওয়াত, জ্ঞানচর্চা ও খেদমত থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এমনকি প্রযুক্তির প্রতি নির্ভরশীলতা এত বেড়ে গেছে যে মানুষ নিজের চিন্তা-শক্তি, ধৈর্য, সহনশীলতানীতিনির্ধারক ও সাধারণ মুসলিম সকলের জন্য উপকারী হবে

প্রযুক্তির বিবর্তন ও প্রেক্ষাপটঃ

প্রযুক্তি” শব্দটি টেকনিক (Technique) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ দক্ষতা, কৌশল, কারিগরি জ্ঞান ও যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা। সহজভাবে বলা যায়—

“মানুষের জীবনকে সহজ ও উন্নত করতে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, যন্ত্র, পদ্ধতি ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ব্যবহৃত হয় তাকে প্রযুক্তি বলা হয়।”

ইসলামী শিক্ষার আলোকে প্রযুক্তি হলো—

আল্লাহর দানকৃত জ্ঞানকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করার একটি মাধ্যম।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

(وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا)

অর্থ: “আদমকে তিনি সবকিছুর নাম ও জ্ঞান শিখিয়ে দেন।”

—(সূরা বাকারা, ২:৩১)

মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রযুক্তি সর্বদা মানুষের অগ্রগতি, জীবনযাত্রার উন্নতি এবং সমাজকে সংগঠিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রযুক্তি ক্রমশ বিকশিত হয়েছে এবং মানুষের জীবনকে সহজ ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রাথমিক যুগে মানুষ আগুনের আবিষ্কার, পাথরের অস্ত্র, চাকাগাড়ি ও কৃষি সরঞ্জাম ব্যবহার করে নিজের জীবনধারণকে সহজ করেছে, যা মানবজীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধান হিসেবে কাজ করেছে। এরপর প্রাচীন সভ্যতাগুলো যেমন মিশর, ব্যাবিলন, চীন ও ভারত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সেচ, নৌকা, গণিত, চিকিৎসা এবং স্থাপত্যের উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছিল, যা মানব সভ্যতার বিকাশকে গতিশীল করেছে। ইসলামি স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীরা এই প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের ধারাকে আরও বিকশিত করেন। ইবনে সিনা চিকিৎসা, ইবনে হায়থম অপটিক্স, আল-বিরুনি জ্যোতির্বিজ্ঞান, আল-জাজারি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আবু আল-কাসিম অস্ত্রোপচারে যে অবদান রেখেছেন, তা আধুনিক প্রযুক্তির ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: «نَعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ» অর্থ: “সৎ মানুষের হাতে ভালো সম্পদ উত্তম।” প্রযুক্তিও একটি সম্পদ; যদি তা সৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তবে এটি কল্যাণমুখী।

২০শ ও ২১শ শতাব্দীতে বিদ্যুৎ, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, স্মার্টফোন, AI, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, রোবট ও চিকিৎসা প্রযুক্তি বিস্তৃত হয়েছে। এটি মানুষের জীবনকে “গ্লোবাল ভিলেজ” রূপে রূপান্তর করেছে। এই যুগ আধুনিক যুগ হিসেবে পরিচিত।

প্রযুক্তি এখন মানুষের দৈনন্দিন জীবন, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন, যোগাযোগ, ব্যবসা ও আধ্যাত্মিক কাজে অপরিহার্য।

তবে, এই অগ্রগতি সাথে নিয়ে এসেছে কিছু প্রাসঙ্গিক চ্যালেঞ্জ—

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি যেমন:

সামাজিক বিভাজন, পারিবারিক ভাঙন, শিশু ও কিশোরদের ওপর প্রভাব, সাইবার অপরাধ

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

অর্থ: “বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না—তারা কি সমান হতে পারে?”

—(সূরা যুমার, ৩৯:৯)

রাসূল ﷺ বলেছেন:

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

অর্থ: “ইলম অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজ।”

এ থেকে বোঝা যায়, প্রযুক্তি মানব কল্যাণে ব্যবহার করলে তা স্বীকৃত ও প্রশংসনীয়। ইসলাম প্রযুক্তিকে নিষিদ্ধ করেনি; বরং জ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারকে মানুষের কল্যাণে এবং নৈতিক উন্নয়নে উৎসাহ দিয়েছে। মূল নীতি হলো—

হালাল ও কল্যাণমুখী ব্যবহার,

মানব অধিকার ও সামাজিক ন্যায় রক্ষা, আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতা ক্ষতিগ্রস্ত না করা, পরিমিত ব্যবহার ও সঠিক নিয়ন্ত্রণ

আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾

অর্থ: “পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ করো না।” (সূরা আরাফ, ৭:৫৬) প্রযুক্তি হলো দ্বিমুখী তরবারির মতো।

একদিকে অগ্রগতি ও কল্যাণ।

অন্যদিকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি। আধুনিক যুগে প্রযুক্তির বিকাশ অপ্রত্যাশিত গতিতে ঘটেছে। বিদ্যুৎ, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, স্মার্টফোন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, স্যাটেলাইট এবং উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তি মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছুঁয়ে গেছে। তবে এই অগ্রগতি মানুষের নৈতিকতা, ঈমান, পরিবার, সমাজ এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ অর্থ: “আদমকে তিনি সবকিছুর নাম ও জ্ঞান শিখিয়ে দেন।” (সূরা বাকারা, ২:৩১) যা প্রমাণ করে, প্রযুক্তির মূল উৎস হলো আল্লাহর প্রদত্ত জ্ঞান। রাসূল ﷺ বলেছেন: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» অর্থ: “ইলম অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজ।” আজকের প্রযুক্তি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। অশ্লীলতা ও পর্নোগ্রাফি মানুষের নৈতিকতা, লজ্জাশীলতা এবং ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আল্লাহ বলেন: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا﴾ অর্থ: “মুমিনদের বলে দাও তারা যেন দৃষ্টিকে সংযত রাখে।” (সূরা নূর, ২৪:৩০) রাসূল ﷺ বলেছেন: «الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» অর্থ: “হায়া ঈমানের একটি শাখা।” সোশ্যাল মিডিয়া, স্মার্টফোন, ভিডিও প্ল্যাটফর্ম এবং গেমসের মাধ্যমে যুবকরা সহজেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিপদের মুখোমুখি হচ্ছে। এটি তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক সম্পর্কেও বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফেসবুক, টিকটক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম এবং অন্যান্য সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মের লাইক, কमेंট এবং অনুসারী বাড়ানোর প্রতিযোগিতা মানুষকে অহং, ঈর্ষা ও হতাশার দিকে ঠেলে দেয়। আল্লাহ বলেন: ﴿الْهَٰكُمُ النَّكَاتُ﴾ অর্থ: “বহুত্বের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে বিমুখ করেছে।” (সূরা তাকাসুর, ১০২:১) এটি আজকের ডিজিটাল দুনিয়ার বাস্তব রূপ। প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার পরিবারে দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সময় না দেওয়া, গোপন চ্যাটিং, অশ্লীল ভিডিও দেখা এবং সামাজিক মাধ্যমের আসক্তি পারিবারিক বন্ধনকে দুর্বল করে। রাসূল ﷺ বলেছেন: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» অর্থ: “তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষণকারী এবং প্রত্যেকেই তার অধীনে দায়িত্বশীল।” শিশুদের উপর প্রযুক্তির প্রভাবও ভয়াবহ। ভিডিও গেমস, ইউটিউব, অশ্লীল কন্টেন্ট এবং অপ্রয়োজনীয় কার্টুন শিশুদের মনোযোগ, মেধা এবং চরিত্রের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ইসলামে শিশুদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক লালন-পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রযুক্তি যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা না হয়, তবে এটি শিশুদের চরিত্র, শিক্ষাগত উন্নতি এবং ভবিষ্যৎকে বিপর্যয়করভাবে প্রভাবিত করে।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যও প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। চোখের সমস্যা, ঘুমের ব্যাঘাত, স্থূলতা, উদ্বেগ, বিষণ্ণতা এবং একাকীত্ব—সবই আধুনিক প্রযুক্তির ফল। প্রযুক্তি মানুষের ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতা থেকেও দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। আল্লাহ বলেন: ﴿وَمَا خَلَقْتُ﴾

﴿الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيُغْنُواكُمُ الْيَوْمَ﴾ অর্থ: “আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য।” (সূরা যারিয়াত, ৫১:৫৬) সাইবার অপরাধ, হ্যাকিং, পরিচয় চুরি, প্রতারণা, গীবত, চুগলবাজি-এসব প্রযুক্তির অপব্যবহারকে আরও বিপজ্জনক করে তুলেছে। রাসূল ﷺ বলেছেন: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» অর্থ: “যে আমাদের ঠকায়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।” (সহিহ মুসলিম) প্রযুক্তি সময়ও নষ্ট করছে; ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ক্রল করা, ভিডিও দেখা, গেম খেলা এবং অকারণে চ্যাটিং মানুষের মূল্যবান সময় চুরি করছে। রাসূল ﷺ বলেছেন: «نعمتان»
«فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»

অর্থ: “দুটি নিয়ামত আছে যার মূল্য মানুষ বুঝতে পারে না: সুস্থতা ও অবসর সময়।”
(তিরমিজী)

তবে, প্রযুক্তি নিজে হারাম নয়। এটি মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করলে সুফল অগণিত। ইসলাম প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রিত, হালাল ও কল্যাণমুখী ব্যবহারের জন্য উৎসাহ দেয়। আল্লাহ বলেন: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ অর্থ: “পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ করো না।” (সূরা আরাফ, ৭:৫৬) প্রযুক্তি ব্যবহার করলে শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, কৃষি, ব্যবসা, সামাজিক কল্যাণ, ইবাদত এবং দাওয়াতকে আরও প্রসারিত করা সম্ভব।

এইভাবে, প্রযুক্তি হলো দ্বিমুখী তরবারি। একদিকে অগ্রগতি ও কল্যাণ, অন্যদিকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি। মানুষের দায়িত্ব হলো প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা, যাতে এটি সমাজ, পরিবার, শিশু, নৈতিকতা এবং ঈমান রক্ষা করে।

প্রযুক্তির প্রকারভেদ

শিক্ষা ও জ্ঞান প্রযুক্তি:

এই প্রযুক্তি মানুষের জ্ঞান অর্জন, শিক্ষাদান এবং গবেষণা সহজ করে। এতে অন্তর্ভুক্ত কম্পিউটার ভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি, অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, ডিজিটাল লাইব্রেরি, ই-ল্যাব এবং শিক্ষামূলক অ্যাপ্লিকেশন। আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

অর্থ: “বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না—তারা কি সমান হতে পারে?” (সূরা যুমার, ৩৯:৯)

রাসূল ﷺ বলেছেন: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» অর্থ: “ইলম অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজ।”

যোগাযোগ ও সংযোগ প্রযুক্তি:

ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফোন, ইমেইল, ভিডিও কল, স্যাটেলাইট প্রযুক্তি মানুষকে বিশ্বের যেকোনো স্থানের সঙ্গে যুক্ত করে। তবে, ইসলামে নির্দেশিত নৈতিকতা অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে যাতে এটি গীবত, চুগলবাজি, প্রতারণা বা অশ্লীলতায় ব্যবহার না হয়।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য প্রযুক্তি:

আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, রোবোটিক সার্জারি, মেডিকেল ইমেজিং, টেলিমেডিসিন, এবং স্বাস্থ্য মনিটরিং ডিভাইস মানুষের জীবন রক্ষা ও রোগ নির্ণয় সহজ করে। রাসূল ﷺ বলেছেন:

«تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً»

অর্থ: “হে আল্লাহর বান্দাগণ! চিকিৎসা করো। আল্লাহ কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার জন্য ঔষধ না রাখেন।”

কৃষি ও পরিবেশ প্রযুক্তি:

কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ব্যবস্থা, হাইড্রোপনিক্স, জলবায়ু মনিটরিং, পরিবেশ সংরক্ষণ প্রযুক্তি মানুষের খাদ্য উৎপাদন এবং পরিবেশ রক্ষা নিশ্চিত করে। আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾

অর্থ: “পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ করো না।” (সূরা আরাফ, ৭:৫৬)

শিল্প ও উৎপাদন প্রযুক্তি:

যন্ত্রপাতি, কারখানা, অটোমেশন, রোবোটিক্স এবং 3D প্রিন্টিং মানব উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ইসলামে শ্রম ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্ব রয়েছে, তবে নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব বজায় রাখতে হবে।

নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি: নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি

সিসিটিভি, আলার্ম সিস্টেম, স্যাটেলাইট নজরদারি, ফায়ার সেফটি, ড্রোন নজরদারি মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে। রাসূল ﷺ বলেছেন:

«المسلمون في تعاونهم خير» অর্থ: “মুসলমানরা একে অপরের প্রতি সহযোগিতায় উত্তম।”

বিনোদন ও অবসর প্রযুক্তি:

সিনেমা, ভিডিও গেম, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, মিউজিক প্লেয়ার এবং বিনোদনমূলক সফটওয়্যার। সঠিক ব্যবহার মানসিক প্রশান্তি ও বিনোদনের জন্য উপকারী। তবে অতিরিক্ত বা অনৈতিক ব্যবহারে নৈতিক অবক্ষয়, সময়ের অপচয় এবং মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়।

ব্যবসা ও আর্থিক প্রযুক্তি (ফিনটেক):

অনলাইন ব্যাংকিং, ই-কমার্স, ডিজিটাল পেমেন্ট, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অটোমেটেড লেনদেন। এগুলো মানুষের আর্থিক লেনদেন সহজ করে, তবে প্রতারণা ও অর্থনৈতিক অনৈতিকতার ঝুঁকিও তৈরি করে।

পরিবহন ও যাতায়াত প্রযুক্তি:

স্মার্ট যানবাহন, ট্রাফিক মনিটরিং, রেল ও বিমান প্রযুক্তি মানুষের যাতায়াত সহজ করে এবং সময় সাশ্রয় করে। ইসলামে নিরাপদ ও সুষ্ঠু যাতায়াতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তথ্য ও গবেষণা প্রযুক্তি:

ডেটা অ্যানালিটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগ ডেটা, ক্লাউড কম্পিউটিং এবং রিসার্চ সফটওয়্যার। এটি বিজ্ঞান, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

শক্তি ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি:

সোলার, উইন্ড, জলবিদ্যুৎ, জ্বালানী সংরক্ষণ প্রযুক্তি এবং পরিবেশ বান্ধব উদ্ভাবন মানুষের জীবন সহজ

যোগাযোগ ও তথ্য নিরাপত্তা প্রযুক্তিঃ

সাইবার নিরাপত্তা, এন্টি-ভাইরাস, এনক্রিপশন, ফায়ারওয়াল-এগুলো অনলাইন তথ্য ও ব্যক্তিগত পরিচয় রক্ষা করে। ইসলামে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

মনোযোগ ও সময় ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তিঃ

প্রোডাকটিভিটি অ্যাপস, ক্যালেন্ডার, রিমাইন্ডার, সময় ট্র্যাকার-এগুলো মানুষের সময় সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করতে সাহায্য করে। রাসূল ﷺ বলেছেন:

«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ» অর্থ: “দুটি নিয়ামত আছে যার মূল্য মানুষ বুঝতে পারে না: সুস্থতা ও অবসর সময়।” (তিরমিজী)

প্রযুক্তির সুফল এবং কুফলঃ

প্রযুক্তির সুফল:

প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সহজ, সুবিধাজনক ও নিরাপদ করার জন্য অপরিসীম ভূমিকা রাখে। শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনে প্রযুক্তি বিশেষভাবে কার্যকর। অনলাইন শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম, ই-লার্নিং, ডিজিটাল লাইব্রেরি, ই-ল্যাব এবং শিক্ষামূলক অ্যাপ্লিকেশন শিক্ষার্থীদের যে কোনো স্থান থেকে জ্ঞান অর্জন ও উন্নয়ন করতে সক্ষম করে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

(وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا)

অর্থ: “হে প্রভু, আমাকে জ্ঞান বৃদ্ধি দাও।” (সূরা তা’ হা, ২০:১১৪)

রাসূল ﷺ বলেছেন: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ», অর্থ: “ইলম অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজ।”

চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রযুক্তি রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং জীবন রক্ষা সহজ করেছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি, টেলিমেডিসিন, রোবোটিক সার্জারি এবং মেডিকেল ইমেজিং মানুষের স্বাস্থ্য উন্নয়নে কার্যকর। রাসূল ﷺ বলেছেন: «تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً», অর্থ: “হে আল্লাহর বান্দাগণ! চিকিৎসা করো। আল্লাহ কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার জন্য ঔষধ না রাখেন।”

যোগাযোগ প্রযুক্তি মানুষকে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করে, যা ব্যবসা, দাওয়াত, শিক্ষা এবং সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে। কৃষি ও পরিবেশ প্রযুক্তি খাদ্য উৎপাদন, সেচ ব্যবস্থা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পর্যবেক্ষণকে সহজ করে। শিল্প ও উৎপাদন প্রযুক্তি উৎপাদন খরচ হ্রাস, শ্রমের সাশ্রয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে। নিরাপত্তা প্রযুক্তি জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে। বিনোদন প্রযুক্তি সঠিক ব্যবহারে মানসিক প্রশান্তি দেয়। সবমিলিয়ে, প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সুবিধাজনক, নিরাপদ, শিক্ষাবান্ধব ও কল্যাণমুখী করে।

প্রযুক্তির কুফল:

অন্যদিকে, প্রযুক্তির অপব্যবহার মানুষের নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, মানসিক ও সামাজিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে। আধুনিক প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় ফাঁদ হলো অশ্লীলতা ও নৈতিক অবক্ষয়। ইন্টারনেট, ভিডিও প্ল্যাটফর্ম, স্মার্টফোন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে শিশু, কিশোর ও যুবকরা সহজেই অশ্লীলতা ও পর্নোগ্রাফির দিকে আকৃষ্ট হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)

অর্থ: “মুমিনদের বলে দাও তারা যেন দৃষ্টিকে সংযত রাখে।” (সূরা নূর, ২৪:৩০)

রাসূল ﷺ বলেছেন: «الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ», অর্থ: “হায়া ঈমানের একটি শাখা।”

প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার পরিবারের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। স্বামী-স্ত্রী ও পিতামাতার সঙ্গে সন্তানদের যোগাযোগ কমে যায়। সোশ্যাল মিডিয়া, ভিডিও কলিং, গেমস এবং অনলাইন চ্যাটিং পারিবারিক সময় নষ্ট করে। রাসূল ﷺ বলেছেন: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْهُ», অর্থ: “তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষণকারী এবং প্রত্যেকেই তার অধীনে দায়িত্বশীল।”

শিশু ও কিশোরদের মানসিক ও নৈতিক বিকাশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভিডিও গেমস, কার্টুন এবং অনলাইন অশ্লীল কন্টেন্ট তাদের চরিত্র, মনোযোগ ও নৈতিকতার বিকাশে বাধা দেয়। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়—চোখের সমস্যা, ঘুমের ব্যাঘাত, স্থূলতা, বিষণ্ণতা ও একাকীত্ব বৃদ্ধি পায়। সোশ্যাল মিডিয়া মানসিক চাপ, অহং, প্রতিযোগিতা এবং হতাশার সৃষ্টি করে। আল্লাহ বলেন: «الْهَآكُمُ التَّكَاثُرُ», অর্থ: “বহুত্বের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে বিমুখ করেছে।” (সূরা তাকাসুর, ১০২:১)

প্রযুক্তি মানুষের ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতা থেকেও দূরে সরিয়ে দেয়। নামাজে খুশু হারানো, কুরআন পাঠ কমে যাওয়া, দোয়া ভুলে যাওয়া—all এই ফাঁদ সৃষ্টি করে। এছাড়া সাইবার অপরাধ, প্রতারণা, পরিচয় চুরি, ব্ল্যাকমেইলিং এবং গীবত প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজ হয়ে গেছে। রাসূল ﷺ বলেছেন: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا», অর্থ: “যে আমাদের ঠকায়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।” প্রযুক্তি যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, তবে এটি শিক্ষার, চিকিৎসার, যোগাযোগের, নিরাপত্তা ও কল্যাণের উৎস। কিন্তু অপব্যবহারে এটি নৈতিক, আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং সামাজিক বিপর্যয় ঘটায়।

প্রযুক্তির ফাঁদ

প্রযুক্তি মানুষের জীবনে অদ্বিতীয় সুবিধা নিয়ে এসেছে। তবে, যেকোনো কল্যাণমুখী উদ্ভাবনের মতোই প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন না করলে এটি বিপজ্জনক ফাঁদে পরিণত হতে পারে। আধুনিক প্রযুক্তির ফাঁদগুলো মূলত নৈতিক, আধ্যাত্মিক, মানসিক ও সামাজিক ক্ষতির দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়।

প্রথমত, অশ্লীলতা ও নৈতিক অবক্ষয় হলো প্রযুক্তির প্রধান ফাঁদ। ইন্টারনেট, ভিডিও প্ল্যাটফর্ম, সোশ্যাল মিডিয়া, এবং স্মার্টফোনের মাধ্যমে শিশু, কিশোর ও যুবকরা সহজেই অশ্লীলতা ও পর্নোগ্রাফির প্রতি আকৃষ্ট হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾

অর্থ: “মুমিনদের বলে দাও তারা যেন দৃষ্টিকে সংযতরাখে।” (সূরা নূর, ২৪:৩০)

রাসূল ﷺ বলেছেন: «الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ», অর্থ: “হায়া ঈমানের একটি শাখা।”

অশ্লীল কন্টেন্ট মানুষের নৈতিকতা, লজ্জাশীলতা এবং ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এটি মানসিক বিকৃতি, যৌন স্বাস্থ্য সমস্যা, ব্যভিচারের প্রবণতা এবং চরিত্রহানি সৃষ্টি করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি ও মানসিক চাপ। ফেসবুক, টিকটক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম-এসব প্ল্যাটফর্ম মানুষের সময়, মনোযোগ এবং মানসিক শান্তি চুরি করছে। লাইক, কमेंট ও ফলোয়ার বাড়ানোর প্রতিযোগিতা মানুষের জীবনে অহং, ঈর্ষা এবং হতাশা সৃষ্টি করছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿الَّذِينَ كَانُوا يَتَفَوَّهُمْ﴾ (অর্থ: “বহুত্বের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে বিমুগ্ধ করেছে।”) (সূরা তাকাসুর, ১০২:১)

তৃতীয়ত, পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষতি। প্রযুক্তির অপব্যবহার স্বামী-স্ত্রী ও পরিবারের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। অশ্লীল চ্যাটিং, ভিডিও কলিং, সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি এবং গেমসের জন্য সময় নষ্ট-সবই পারিবারিক বন্ধন ক্ষতিগ্রস্ত করে। রাসূল ﷺ বলেছেন:

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

অর্থ: “তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষণকারী এবং প্রত্যেকেই তার অধীনে দায়িত্বশীল।” চতুর্থত, শিশু-কিশোরদের ওপর প্রভাব। ভিডিও গেমস, অশ্লীল কন্টেন্ট, ইউটিউব এবং কার্টুন শিশুদের বাস্তব জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি তাদের মনোযোগ, চরিত্র, আচরণ এবং নৈতিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।

পঞ্চমত, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সমস্যা। প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার চোখের সমস্যা, ঘুমের ব্যাঘাত, স্থূলতা, মানসিক চাপ, বিষণ্ণতা এবং একাকীত্ব সৃষ্টি করে। বিশেষত সোশ্যাল মিডিয়া মানসিক অবসাদ ও আত্মমর্যাদা হ্রাসের অন্যতম কারণ।

ষষ্ঠত, ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতা থেকে বিচ্যুতি। প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার মানুষের নামাজে খুশু, কুরআন পাঠ এবং দোয়ায় মনোযোগ হ্রাস করে। আল্লাহ বলেন:

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (অর্থ: “আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য।” (সূরা যারিয়াত, ৫১:৫৬)

সপ্তমত, সাইবার অপরাধ ও প্রতারণা। প্রযুক্তি হ্যাকিং, পরিচয় চুরি, ব্ল্যাকমেইলিং, প্রতারণা এবং গীবত ও চুগলবাজির সুযোগ সৃষ্টি করেছে। রাসূল ﷺ বলেছেন:

«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»,

অর্থ: “যে আমাদের ঠকায়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।” (সহিহ মুসলিম)

অষ্টমত, সময় অপচয়। প্রযুক্তি মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ক্রল করতে বাধ্য করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ভিডিও, গেমস ও চ্যাটিং মানুষের সময় ও জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ চুরি করে। রাসূল ﷺ বলেছেন:

«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»

অর্থ: “দুটি নিয়ামত আছে যার মূল্য মানুষ বুঝতে পারে না: সুস্থতা ও অবসর সময়।” (তিরমিজী)নবমত, নৈতিক অবক্ষয় ও অহংকার বৃদ্ধি। প্রযুক্তি অহং, প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা এবং সামাজিক অশান্তি বাড়ায়। এটি মানুষকে দুনিয়ার মোহে ফেলে এবং আধ্যাত্মিকতায় দুর্বল করে।

দশমত, শিশুদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশে বাধা। প্রযুক্তি যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকে, শিশু ও কিশোরদের চরিত্র ও ঈমান দুর্বল হয়ে যায়।

অতএব, আধুনিক প্রযুক্তির ফাঁদ হলো—অশ্লীলতা, মানসিক চাপ, পরিবারে দূরত্ব, শিশুদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি, শারীরিক সমস্যা, ইবাদত থেকে বিচ্যুতি, সাইবার অপরাধ, সময়ের অপচয় এবং নৈতিক অবক্ষয়। ইসলামে প্রযুক্তি ব্যবহারের মূলনীতি হলো হালাল ও কল্যাণমুখী ব্যবহার, সতর্কতা, পরিমিতি এবং ঈমান রক্ষা করা।

প্রযুক্তির মনস্তাত্ত্বিক ফাঁদ

প্রযুক্তির প্রতি আসক্তি: সংজ্ঞা ও লক্ষণ

ব্যক্তির মন ও মস্তিষ্ক যখন কোনো বস্তু, আচরণ বা অভিজ্ঞতার প্রতি এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যে সেটি ছাড়া সে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে না, তখন তাকে আসক্তি (Addiction) বলা হয়। আধুনিক প্রযুক্তি—বিশেষ করে স্মার্টফোন, গেমস, সোশ্যাল মিডিয়া, শর্ট ভিডিও, নোটিফিকেশন এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট—এই আসক্তিকে মানুষের জীবনে ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে। আসক্তির মূল কারণ মানুষের মস্তিষ্কে ডোপামিন নামে এক ধরনের রাসায়নিকের অতিরিক্ত নিঃসরণ। প্রযুক্তি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে মানুষ বারবার সেটিতে ফিরে আসে এবং ধীরে ধীরে তার উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

আসক্তির লক্ষণসমূহ

মোবাইল ছাড়া স্বাভাবিকভাবে থাকতে না পারা
বারবার ফোন চেক করা, এমনকি প্রয়োজন না থাকলেও

ঘুমানোর আগে ও উঠেই প্রথম কাজ মোবাইল দেখা
নোটিফিকেশন না এলেও কল্পনাপ্রসূত নোটিফিকেশন অনুভব
পড়ালেখা, ইবাদত, পরিবার—সবকিছু পিছিয়ে দেওয়া
মানুষ থেকে দূরে থাকা, কিন্তু ভার্চুয়াল জগতে সক্রিয় থাকা
বিরক্তি, রাগ, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি
সময় পরিকল্পনা হারিয়ে ফেলা

এসব লক্ষণ অনেকাংশে মাদকাসক্তির লক্ষণের সাথে মিলে যায়, যা প্রযুক্তির ভয়াবহতা প্রকাশ করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে আসক্তির নিষেধাজ্ঞা
আল্লাহ বলেন—

(وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)

অর্থ: “তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না।”

—(সূরা আল-বাকারা, ২:১৯৫)

এমন সব ব্যবহার যা মানুষকে নিজ নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচ্যুত করে, তাকে গাফলতের মধ্যে ফেলে—ইসলামে তা নিষিদ্ধ।

রাসুল ﷺ বলেন:

«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

“যে সব বস্তু মানুষকে বেহুঁশ করে, তার সবই হারাম।”

—সহিহ মুসলিম

যদিও প্রযুক্তি সরাসরি “মাদক” নয়, কিন্তু এর দ্বারা সৃষ্ট মানসিক বেহুঁশি, নিয়ন্ত্রণ হারানো এবং সময় নষ্ট করা—মাদকের মতোই ক্ষতিকর।

ডোপামিন লুপ এবং সোশ্যাল মিডিয়া অ্যালগরিদমঃ

প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় মনস্তাত্ত্বিক ফাঁদ হলো ডোপামিন লুপ—একটি প্রক্রিয়া যেখানে ব্যবহারকারীকে বারবার অ্যাপ খুলতে উৎসাহিত করার মতো কন্টেন্ট দেখানো হয়। প্রতিটি লাইক, কমেণ্ট, নোটিফিকেশন, নতুন ভিডিও—সবই মস্তিষ্কে ক্ষুদ্র ডোপামিন নিঃসরণ ঘটায়। এই ক্ষুদ্র সুখ আসলে ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু অতি শক্তিশালী। সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে এমন অ্যালগরিদম তৈরি করে যাতে মানুষ অ্যাপে আসক্ত থাকে।

অ্যালগরিদম কীভাবে কাজ করে

আপনি কোন ভিডিও দেখলেন

কতক্ষণ দেখলেন

কোন পোস্টে রিঅ্যাক্ট করলেন

কোন ধরনের কন্টেন্টে স্ক্রল থামালেন

এসব বিশ্লেষণ করে অ্যালগরিদম আপনাকে “আপনার মস্তিষ্ক যেটা দেখে আনন্দ পায়” সেইসব কন্টেন্টই দিতে থাকে। ফলে আপনি একবার ঢুকলে বের হতে পারেন না।

এটি আসলে “আকস্মিক পুরস্কার ব্যবস্থা” (intermittent reward system), যা ক্যাসিনো গেম বা জুয়া খেলার মতোই আসক্তিকর।

কুরআনের দৃষ্টিতে নফসকে উত্তেজিত করা

আল্লাহ বলেন—

﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾

অর্থ: “নফস মানুষকে মন্দ কাজের দিকেই প্ররোচিত করে।”

—সূরা ইউসুফ, ১২:৫৩

অ্যালগরিদমের মূল লক্ষ্যও একই—নফসকে উসকানো, দুর্বল দিকগুলো কাজে লাগানো, মানুষকে গাফেল বানানো।

রাসুল ﷺ বলেন:

«إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً»

“প্রত্যেক বস্তুর একটি প্রবল প্রবণতা রয়েছে (যা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়)।”

—ইবন মাজাহ

সোশ্যাল মিডিয়া সেই প্রবণতাকে পূর্ণ ক্ষমতায় উত্তেজিত করে।

ফোমো (FOMO - Fear Of Missing Out) সিনড্রোম:

এটি প্রযুক্তির এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক রোগ। FOMO মানে “বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার ভয়” – অর্থাৎ, মনে হয় অন্যরা অনলাইনে অনেক ভালো কিছু করছে, আমি বাদ পড়ে যাচ্ছি। এই ফিয়ার তৈরি হয়:

অন্যের সুখী ছবি

ভ্রমণের পোস্ট

রিল

সম্পর্কের প্রদর্শন

ব্যক্তিগত সাফল্যের কন্টেন্ট

FOMO মস্তিষ্কে ভয়, হতাশা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করে।

FOMO এর লক্ষণ

অন্যরা কী পোস্ট করছে সবসময় চেক করা

নিজের জীবনে অপ্রাপ্তির অনুভূতি

নিজের সাফল্যকে ছোট ভাবা

মানুষের বাস্তব জীবনকে সোশ্যাল মিডিয়ার ফিল্টার করা জীবনের সঙ্গে তুলনা করা

হতাশা, ঈর্ষা, ডিপ্রেসন বৃদ্ধি

**ইসলামী দৃষ্টিতে

এটি আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের প্রতি অশান্তি সৃষ্টি করে।**

আল্লাহ বলেন—

﴿وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾

অর্থ: “আমি যাকে যা দিয়েছি, তার দিকে লোভভরে তাকিও না।”

—সূরা হিজর, ১৫:৮৮

রাসুল ﷺ বলেন:

«انظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ»

“তোমরা তোমাদের চেয়ে নিচে অবস্থানে যাদের তাদের দিকে তাকাও।”

—সহিহ মুসলিম

সোশ্যাল মিডিয়া এই শিক্ষার উল্টো পরিবেশ তৈরি করে—মানুষকে সবসময় “উপরে থাকা” মানুষের জীবন দেখায়।

অ্যাটেনশন স্প্যান বা মনোযোগের ঘাটতি:

টিকটক, শর্ট ভিডিও, রিল—এগুলো মানুষের মস্তিষ্কে এত দ্রুতগতির কন্টেন্টের সঙ্গে অভ্যস্ত করে যে দীর্ঘ সময় মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এটাকে বলা হয় “Digital ADHD” বা “Attention Deficit”।

মস্তিষ্ক কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়

দীর্ঘ লেখা পড়তে কষ্ট হয়

নামাজ দীর্ঘ হলে অস্থিরতা

ক্লাসে মন বসে না

বই পড়া অসম্ভব মনে হয়

পড়াশোনার গভীর মনোযোগ নষ্ট হয়

সহজ বিষয়েরও ব্যাখ্যা বুঝতে সমস্যা হয়

ইসলামী দৃষ্টিতে মনোযোগের গুরুত্ব

আল্লাহ বলেন—

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾

অর্থ: “মুমিনরা সফল, যারা তাদের নামাজে খুশুআন থাকে।”

—সূরা মুমিনুন, ২৩:১-২

মনোযোগ হীনভিন্নকারী প্রযুক্তি খুশু নষ্টের অন্যতম কারণ।

রাসুল ﷺ বলেন:

«مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ... يُرْفَعُ الْعِلْمُ وَيَتُبْتُ الْجَهْلُ»

“কিয়ামতের লক্ষণগুলোর একটি—জ্ঞান উঠিয়ে নেওয়া এবং অজ্ঞতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া।”

—সহিহ বুখারি

মনোযোগ হারানো—এই অজ্ঞতার অন্যতম উৎস।

৩.৫ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বনাম বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্ব

মানুষ এখন বাস্তব জীবন থেকে পালিয়ে ভার্চুয়াল জগতে আশ্রয় নিচ্ছে। এখানে সে নিজের ইচ্ছেমতো পরিচয় তৈরি করতে পারে, নিজের মতো জীবন সাজাতে পারে—যা বাস্তবে পারে না। ফলে বাস্তবতা তার কাছে ক্লাস্তিকর হয়ে ওঠে।

ভার্চুয়াল বনাম বাস্তব দ্বন্দের প্রকাশ

বাস্তব বন্ধু বাদ দিয়ে অনলাইন বন্ধুত্বে আগ্রহ

বাস্তব জীবনে একাকীত্ব

ভিডিও গেম বা ভার্চুয়াল অর্জনকে বাস্তব অর্জনের চেয়ে বড় মনে করা

বাস্তব সমস্যাকে এড়িয়ে ডিজিটাল জীবনে ডুবে থাকা

ইসলামী দৃষ্টিতে সত্যের মুখোমুখি হওয়ার শিক্ষা

আল্লাহ বলেন—

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ﴾

অর্থ: “এই দুনিয়ার জীবন তো ক্রীড়া ও খেলামাত্র।”

—সূরা আনকাবূত, ২৯:৬৪

আজকের ভার্চুয়াল বিশ্ব এই “লাহ্‌ও ও লায়িব” -এর আধুনিক রূপ, যা মানুষকে বাস্তব দায়িত্ব থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

রাসুল ﷺ বলেন:

«كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت»

“কারো জন্য এতটুকুই পাপ যে সে তার দায়িত্বভুক্ত লোকদের অবহেলা করে।”

—সুনান আবু দাউদ

প্রযুক্তির ভার্চুয়াল জগৎ বাস্তব দায়িত্ব অবহেলায় বড় ভূমিকা রাখছে।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব:

শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা ও স্থূলতা

বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর জীবনযাত্রায় মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপ আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় দ্রুতগতিতে কমে গেছে। স্মার্টফোন, কম্পিউটার, ভিডিও গেম, স্ট্রিমিং সার্ভিস, অনলাইন ক্লাস ও রিমোট ওয়ার্কের সুবিধা একদিকে মানুষের কাজকে সহজ করেছে, অন্যদিকে শারীরিক কার্যকলাপকে একেবারে ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। এই দীর্ঘমেয়াদী নিষ্ক্রিয়তা শরীরে অতিরিক্ত চর্বি সঞ্চিৎ করে স্থূলতার দিকে নিয়ে যায়, যা বর্তমানে একটি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সমস্যায় পরিণত হয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর জীবনযাত্রায় শারীরিক নিষ্ক্রিয়তার বৃদ্ধি

মানুষ এখন গ্রোসারি শপিং, বিল প্রদান থেকে শুরু করে খাবার অর্ডার-সবকিছুই মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ঘরে বসেই করতে পারে। এর ফলে হাঁটা, বাইরে যাওয়া, শারীরিক পরিশ্রম ইত্যাদি ব্যাপক কমে গেছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনলাইন ক্লাস, গেমিং বা সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ক্রল করে, যা তাদের শরীরকে স্থবির করে তোলে।

২. দীর্ঘ সময় বসে থাকার ক্ষতিকর দিক

দিনে ৬-৮ ঘণ্টার বেশি সময় বসে থাকা হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও মেটাবলিক সিনড্রোমের ঝুঁকি ৪০-৬০% পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়।

এটি পেশির কার্যকারিতা কমায়, রক্ত সঞ্চালন ধীর করে এবং মেরুদণ্ডে মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে।

৩. প্রযুক্তি ও স্থূলতার সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

ডিজিটাল কার্যকলাপের সময় শরীর কম শক্তি ব্যয় করে। একই সঙ্গে দীর্ঘসময় স্ক্রিন দেখলে মস্তিষ্কের ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণকারী অংশে প্রভাব পড়ে, ফলে মানুষ অপ্রয়োজনে স্ন্যাকস বা জাঙ্ক ফুড খায়। এছাড়া স্ক্রিনের আলো (Blue Light) মেলাটোনিन কমিয়ে ঘুম নষ্ট করে, যার ফলে হরমোনােল ভারসাম্য নষ্ট হয়ে ওজন বাড়ে।

৪. শিশু-কিশোরদের স্থূলতা বৃদ্ধির কারণ

অতিরিক্ত মোবাইল-গেম

অনলাইন ক্লাস

বাইরের খেলাধুলা কমে যাওয়া

রাত জেগে গেমিং

ইউটিউব ও শর্ট ভিডিও দেখা

এগুলো তাদের শারীরিক কার্যকলাপকে প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনে। ইসলামি দৃষ্টিকোণ ইসলাম শরীরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে উল্লেখ করেছে। শারীরিক শক্তি বজায় রাখার বিষয়ে হাদিসে এসেছে—

“শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়।” (সহিহ মুসলিম)

প্রযুক্তির কারণে দুর্বল, অলস ও স্থূল হয়ে পড়া ইসলামের কাজের বিপরীত।

চোখের সমস্যা ও ডিজিটাল আই স্ট্রেইন (Digital Eye Strain / Computer Vision Syndrome):

দীর্ঘসময় স্ক্রিন ব্যবহারের অন্যতম গুরুতর প্রভাব হলো “ডিজিটাল আই স্ট্রেইন” বা “কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম (CVS)”, যার মাধ্যমে চোখের অস্বস্তি, ব্যথা, ঝাপসা দেখা, চোখ শুকিয়ে যাওয়া, মাথা ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। আধুনিক যুগে এটি বিশ্বজুড়ে একসাধারণ স্বাস্থ্যসমস্যায় পরিণত হয়েছে।

১. স্ক্রিনের আলো চোখের জন্য কীভাবে ক্ষতিকর?

স্ক্রিন থেকে নির্গত নীল আলো (Blue Light) চোখের কোষে চাপ সৃষ্টি করে। দীর্ঘ সময় স্ক্রিন দেখলে—

চোখ পলক ফেলার হার ৬০% পর্যন্ত কমে যায়, ফলে চোখ শুকিয়ে যায়

রেটিনার উপর দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি তৈরি হয়

চোখের লেন্সে চাপ পড়ে, দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পায়

ছবি বা লেখা কিছুক্ষণ পর ঝাপসা দেখা শুরু হয়

২. ডিজিটাল আই স্ট্রেইনের লক্ষণ

চোখ জ্বালা করা, চোখ শুকিয়ে যাওয়া, ঝাপসা দৃষ্টি, মাথা ব্যথা

আলোতে সহ্যশক্তি কমে যাওয়াঘাড় ও কাঁধ ব্যথা (Skewed posture effect)

৩. ছোট বয়সে স্মার্টফোন ব্যবহারের ঝুঁকি

শিশুর চোখের লেন্স এখনও নরম থাকে, ফলে নীল আলোর ক্ষতি বেশি হয়। এজন্য কম বয়সে স্ক্রিন টাইম বাড়লে—

মায়োপিয়া (Myopia – দূরে দেখতে না পারা) দ্রুত বাড়ে

চোখের স্নায়ু দুর্বল হয়

মাথা ব্যথা ও মনোযোগ বিভ্রাট তৈরি হয়

বর্তমানে Myopia বিশ্বব্যাপী মহামারির রূপ নিয়েছে, যার অন্যতম কারণ স্মার্টফোন।

৪. দীর্ঘমেয়াদে চোখের স্থায়ী ক্ষতি

বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন—

প্রতিদিন ৪-৬ ঘণ্টা স্ক্রিন ব্যবহারকারীর ৬-৮ বছরের মধ্যে চোখের পাওয়ার বাড়ার সম্ভাবনা ৪ গুণ বেশি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকুলার ডিজেনারেশন (অন্ধত্বের একটি বড় কারণ) হতে পারে।

৫. স্ক্রিন টাইম ও ঘুমের সমস্যা

স্ক্রিন থেকে নির্গত নীল আলো মেলাটোনিन হরমোন কমিয়ে দেয়। ফলে ঘুম আসতে দেরি হয়, ঘুম ভেঙে যায়, মাথা ভার লাগে—এগুলো আবার চোখের উপর বাড়তি চাপ তৈরি করে।

৬. ইসলামের দৃষ্টিতে চোখের হিফাজত

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“চোখকে নিচু রাখো।” (সূরা নূর: ৩০-৩১)

চোখকে অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়াও ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে চোখ নষ্ট করা আল্লাহর আমানত নষ্ট করার শামিল।

অনিদ্রা ও স্লিপ সাইকেল ব্যাঘাত

প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার, বিশেষত স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, টিভি এবং গেমিং ডিভাইসের দীর্ঘমেয়াদি স্ক্রিন টাইম মানবদেহের স্বাভাবিক ঘুম-জাগরণ চক্র (Circadian Rhythm)কে গভীরভাবে ব্যাহত করে। স্ক্রিনের নীল আলো মস্তিষ্কে মেলাটোনিন হরমোন নিঃসরণ কমিয়ে দেয়, যা ঘুমের প্রধান নিয়ন্ত্রক। ফলে ঘুম আসতে দেরি হওয়া, রাতে বারবার জেগে ওঠা, গভীর ঘুম না হওয়া, সকালে মাথা ভার লাগা, ক্লান্তি বা অবসাদ—এসব সমস্যা দেখা দেয়।

১. নীল আলোর (Blue Light) ক্ষতিকর প্রভাব
নীল আলোর (Blue Light) ক্ষতিকর প্রভাব
প্রযুক্তির স্ক্রিন থেকে এমন এক ধরনের আলো নির্গত হয় যা মস্তিষ্কে “এখনও দিন” – এমন সংকেত দেয়।

ফলে—

ঘুমের হরমোন নিঃসরণ ৫০-৭০% পর্যন্ত কমে যায়

ব্রেইনের স্লিপ সেন্টার সক্রিয় হতে দেরি করে

রাত ১২টার পর ঘুমের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়

স্বাভাবিক ঘুমের চক্র ভেঙে যায়

২. সোশ্যাল মিডিয়া ও দেরি করে ঘুমানো

“স্ক্রলিং লুপ” এবং “অটোপ্লে ফিচার” মানুষকে অজান্তেই রাত জাগতে বাধ্য করে।

বিশেষ করে—সোশ্যাল মিডিয়া ও দেরি করে ঘুমানো

“স্ক্রলিং লুপ” এবং “অটোপ্লে ফিচার” মানুষকে অজান্তেই রাত জাগতে বাধ্য করে।

বিশেষ করে—

ইউটিউব অটোপ্লে

ফেসবুক/টিকটক ইনফিনিটি স্ক্রল

রাতের মেসেজিং

গেমিং

এসব আচরণ মস্তিষ্কে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, যা ঘুমকে বিলম্বিত করে।

৩. স্লিপ ডিসঅর্ডারের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি

দীর্ঘ সময় ঘুমের ব্যাঘাত হলে—দুর্বল হওয়া

হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি

টাইপ ২ ডায়াবেটিস

মানসিক চাপ বৃদ্ধি

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া

ব্রেইন ফগ ও মনোযোগের ঘাটতি

৪. শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি

রাত জেগে গেম খেলা বা ভিডিও দেখা তাদের—

হরমোনাল ব্যালান্স নষ্ট করে

বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে

শেখার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়

৫. ইসলামি দৃষ্টিকোণ

রাতে ঘুম এবং ফজরের আগে জাগ্রত হওয়াকে ইসলামে বরকত বলা হয়েছে।

রাসূল ﷺ বলেন:রাতে বেশি কথা না বলে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো।” (তিরমিজি)

প্রযুক্তির কারণে রাতজাগরণ এ সুন্নাহভিত্তিক অভ্যাস থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়।

ডিপ্রেশন, একাকীত্ব ও উদ্বেগ (Depression, Loneliness & Anxiety):

প্রযুক্তির উত্থান মানুষের যোগাযোগ সহজ করলেও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব গভীর। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া মানুষের আবেগ, আত্মসম্মানবোধ, সামাজিক সম্পর্ক এবং মানসিক স্থিতিশীলতার ওপর ক্ষতিকর চাপ ফেলে।

১. সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিপ্রেশন

অত্যধিক সোশ্যাল মিডিয়া ব্রাউজিং মানুষকে তুলনা প্রবণ করে।

যেমন-অন্যের সুখ দেখে নিজের জীবনকে কম মূল্যবান মনে হওয়া

বাহ্যিক সৌন্দর্য/সাফল্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করা

লাইক-কমেন্ট না পেলে আত্মসম্মানবোধ কমে যাওয়া

এগুলো ক্রমশ হতাশা (Depression) বৃদ্ধি করে।

২. একাকীত্বের আধুনিক রূপ

প্রযুক্তি মানুষকে “ভার্চুয়ালি কানেকটেড কিন্তু বাস্তবে বিচ্ছিন্ন” করে।

আজকের প্রজন্ম—

পরিবারে থেকেও পরিবারের সঙ্গে কম কথা বলে

বন্ধুদের পাশে থেকেও মোবাইলে ব্যস্ত থাকে

বাস্তব সম্পর্কের তুলনায় ভার্চুয়াল বন্ধুত্বকে বেশি গুরুত্ব দেয় ফলে মানসিক একাকীত্ব বাড়ে, যা সামাজিক বিচ্ছিন্নতার রূপ নেয়।

৩. উদ্বেগ (Anxiety) বৃদ্ধি

অতিরিক্ত নোটিফিকেশন

মেসেজ রিপ্লাই না পেলে মানসিক চাপ

অনলাইন হুমকি, সাইবার বুলিং

প্রাইভেসি নিয়ে ভয়

অনলাইন উপস্থিতি বজায় রাখার চাপ

এসব বিষয় মানুষের মস্তিষ্কে ক্রমাগত চাপ তৈরি করে উদ্বেগ বাড়ায়।

৪. অ্যালগরিদম ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ

সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম এমনভাবে কাজ করে—

উত্তেজনা কর, বিতর্কমূলক, ভয়ের উদ্বেককারী নেগেটিভ সংবাদ এসব পোস্ট বেশি দেখায়, যা মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

৫. শিশু-কিশোরদের মানসিক সমস্যার বৃদ্ধি

আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি

সাইবার বুলিং-এর ট্রমা

আত্মসম্মানবোধ কমে যাওয়া

সামাজিক দক্ষতা দুর্বল হওয়া

ডিপ্রেশন শিশুদের জন্য আজ বড় সংকট।

৬. ইসলামি পরিপ্রেক্ষিত

অতিরিক্ত দুনিয়া মুখী আকাঙ্ক্ষা মানুষের অন্তরে দুঃখ বাড়ায়।

আল্লাহ বলেন:

“নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণেই হৃদয়ের প্রশান্তি।” (সূরা রা’ দ: ২৮)

প্রযুক্তি মানুষের হৃদয়কে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে মানসিক অস্থিরতা বাড়ায়

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন ও স্বাস্থ্যঝুঁকি (Electromagnetic Radiation & Health Risks):

আধুনিক প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত মোবাইল ফোন, ওয়াইফাই রাউটার, ব্লুটুথ ডিভাইস, স্যাটেলাইট সিগনালসহ সবকিছুই বিভিন্ন মাত্রার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন (EMR) নির্গত করে। যদিও বেশিরভাগ রেডিয়েশন “নন-আয়নাইজিং” –তবুও দীর্ঘমেয়াদে এগুলো মানুষের দেহে নানা ঝুঁকির সম্ভাবনা তৈরি করে।

১. EMR কীভাবে কাজ করে?

মোবাইল ও ওয়াইফাই ডিভাইস রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির মাধ্যমে সিগনাল আদান-প্রদান করে।

এসব তরঙ্গ–

শরীরের কোষে স্বল্পমাত্রায় উত্তাপ সৃষ্টি করে

সেলুলার কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে সেলুলার কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে

স্নায়ুতন্ত্রের সংবেদনশীল অংশে চাপ সৃষ্টি করে

২. সম্ভাব্য স্বাস্থ্যঝুঁকি

বিভিন্ন গবেষণায় EMR এর সম্ভাব্য প্রভাব পাওয়া গেছে—

মাথা ব্যথা, ক্লান্তি, ঘুমের সমস্যা, মনোযোগের ঘাটতি, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, হরমোনাল ব্যালান্সে পরিবর্তন

কিছু গবেষণায় দীর্ঘমেয়াদে টিউমার/ক্যান্সারের ঝুঁকির কথাও উল্লেখ আছে (যদিও এটি এখনো বিতর্কিত)। শিশুদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বেশি কেন?

শিশুর—

করোটি পাতলা

স্নায়ুতন্ত্র আরও সংবেদনশীল

শরীরের জলীয় অংশ বেশি

ফলে তারা রেডিয়েশন বেশি শোষণ করে।

৪. রাতে মাথার কাছে মোবাইল রেখে ঘুমোনো

রাতে মোবাইল অন রেখে মাথার কাছে রাখা—

EMR এক্সপোজার বাড়ায়

ব্রেইন ওয়েভে প্রভাব ফেলতে পারে

স্লিপ সাইকেল ব্যাহত করে

বিশেষজ্ঞরা মোবাইল মাথার কাছে রেখে ঘুমাতে নিষেধ করেন।

৫. ওয়াইফাই ও ঘরের রেডিয়েশন এক্সপোজার

ঘরে ২৪ ঘণ্টা ওয়াইফাই চালু থাকা, একাধিক ডিভাইস ব্যবহার, স্মার্ট হোম প্রযুক্তি—এসব

EMR এর ঘনত্ব বাড়ায়।

৬. ইসলামি দৃষ্টিকোণ

শরীরকে ক্ষতির মুখে ফেলা ইসলামে নিষিদ্ধ।

“নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না।” (সূরা বাকারা: ১৯৫)

অতিরিক্ত প্রযুক্তি এমনই এক ক্ষতি যা ধীরে ধীরে মানুষের স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সামাজিক ও পারিবারিক অবক্ষয়

প্রযুক্তির প্রভাব সমাজ ও পরিবারের উপর গভীর এবং বহুস্তর বিশ্লেষণযোগ্য। আধুনিক প্রযুক্তি যেমন মানুষের জীবনকে সহজ ও দ্রুততর করেছে, তেমনি এটি মানুষের মূল্যবোধ, চরিত্র, পারিবারিক বন্ধন, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সামাজিক আচরণে এমন এক পরিবর্তন এনেছে যা দীর্ঘমেয়াদে সমাজকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দিচ্ছে। প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার কল্যাণ বয়ে আনলেও এর অপব্যবহার এবং অতিরিক্ত নির্ভরতা মানুষের মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ও পারিবারিক কাঠামোতে ধস নামাচ্ছে।

ইসলাম মানবসমাজকে সুদৃঢ় পরিবার ও সং নৈতিকতার ভিত্তিতে দাঁড় করাতে চায়। কিন্তু প্রযুক্তি-সৃষ্ট বিভ্রান্তি, ফিতনা, অশ্লীলতা, সময় নষ্ট, দৃষ্টির অপচয়, মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলা এবং সম্পর্ক ভাঙনের মতো বিষয়সমূহ সমাজের সেই ভিত্তিকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ)

অর্থ: “স্থলে ও জলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে মানুষের কৃতকর্মের কারণে।” (সূরা রুম, ৩০:৪১)
প্রযুক্তির অপব্যবহারও মানুষের কৃতকর্মের মাধ্যমে সমাজে একটি ভয়াবহ অবক্ষয় সৃষ্টি করছে।

পারিবারিক বন্ধন ও আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের অবনতি:

আধুনিক প্রযুক্তির সবচেয়ে দৃশ্যমান ক্ষতির জায়গা হলো পরিবার। পরিবার সমাজের ক্ষুদ্রতম কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট। যখন পরিবার দুর্বল হয়—সমাজ স্বভাবতই ভেঙে পড়ে।

১. পরিবারের মধ্যে কথোপকথন কমে যাওয়া

আগে পরিবারে সবাই একসঙ্গে বসে কথা বলত, খেলা করত, খাদ্য গ্রহণ করত। এখন প্রতিটি সদস্য—

বাবা: মোবাইল/ফেসবুক

মা: ইউটিউব/ড্রামা

সন্তান: গেমস/কার্টুন

ফলে একই ছাদের নিচে থেকেও সবাই আলাদা জগতে বসবাস করছে।

২. দাম্পত্য জীবনে প্রযুক্তির হস্তক্ষেপ

- .দাম্পত্য সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা কমে যাওয়া
- .মোবাইলে সময় দেওয়ার কারণে স্বামী/স্ত্রীর অবহেলা
- .অশ্লীল কনটেন্ট আসক্তি থেকে ব্যভিচার
- .সন্দেহ, মনোমালিন্য, ঝগড়া
- .একে অপরের প্রতি আবেগ কমে যাওয়া

রাসূল ﷺ বলেন—

«إِنَّ مِنْ أَسْرَرِ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»
অর্থ: "কিয়ামতের দিনে নিকৃষ্টতম মানুষের একজন সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের গোপন তথ্য প্রকাশ করে।"

(সহিহ মুসলিম)

সোশ্যাল মিডিয়া দাম্পত্য জীবনকে উন্মুক্ত ও বিপজ্জনক পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

৩. পরিবারের আবেগীয় সংযোগ ভেঙে যাওয়া

শিশু ও কিশোররা বাবা-মায়ের থেকে শেখে আচরণ, চোখের ভাষা, অনুভূতি।
কিন্তু আজ—

.বাবা-মা ফোনে ব্যস্ত

.শিশু ট্যাব/মোবাইলে ব্যস্ত

ফলে আবেগীয় বন্ধন কমে যাচ্ছে।

৪. রাত জাগা ও পরিবারের সময় নষ্ট

পরিবারে একত্রে সময় কাটানোর পরিবর্তে—

.রাতভর স্ক্রলিং

.অনলাইন গেম

ড্রামা/সিরিজ

দাম্পত্য সম্পর্ক দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

৫. পারিবারিক দায়িত্ব অবহেলা

ইসলামে পরিবারকে রক্ষা করা ফরজ দায়িত্ব।

রাসূল ﷺ বলেন—

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ»

অর্থ: "তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত এবং প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল।"

(সহিহ বুখারি)

কিন্তু প্রযুক্তির কারণে—

.দাম্পত্য দায়িত্ব

.সন্তান লালন-পালন

.বয়োজ্যেষ্ঠের যত্ন

.ঘর-পরিবার

সবকিছুই আজ অবহেলিত।

৬. অশ্লীলতা পরিবার ধ্বংসের বড় কারণ

স্মার্টফোন অশ্লীলতায় প্রবেশকে অত্যন্ত সহজ করেছে।

এর ফলে—

বিশ্বাস নষ্ট, প্রতারণা, ব্যভিচার, পরিবারভাঙন, বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি

সবই সমাজে দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে।

ভার্চুয়াল যোগাযোগ বনাম প্রত্যক্ষ যোগাযোগ:

মানুষ স্বভাবগতভাবে সামাজিক প্রাণী। প্রত্যক্ষ যোগাযোগ—চোখের ভাষা, হাসি, অনুভূতি, কণ্ঠস্বর—এসব মানুষের সম্পর্ককে দৃঢ় করে। কিন্তু প্রযুক্তি মানুষকে ভার্চুয়াল যোগাযোগে আবদ্ধ করে ফেলেছে।

১. ভার্চুয়াল যোগাযোগে আবেগের অভাব

অনলাইনে শুধু টেক্সট ও ইমোজির মাধ্যমে যোগাযোগ হয়।

ফলে—

অনুভূতি সঠিকভাবে প্রকাশ পায় না,ভুল বোঝাবুঝি বাড়ে
,গম্ভীর সম্পর্ক দুর্বল হয়

২. প্রত্যক্ষ যোগাযোগের দক্ষতা কমে যাওয়া
প্রযুক্তির কারণে তরুণ প্রজন্ম—

চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে না,সামাজিক আচরণ দুর্বল,প্রকাশভঙ্গি কমগেছে,আবেগ
নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না

একে বলা হয় Social Skill Collapse।

৩. পরিবারের মধ্যে বাস্তব যোগাযোগ হারানো
একই বাড়িতে থেকেও পরিবারের সদস্যরা—

.মেসেজে কথা বলে,কল দিয়ে কথা বলে,ভিডিও কলে কথা বলে
.ফলে বাস্তব অভিজ্ঞতা লোপ পাচ্ছে।

৪. ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের পতন
ভার্চুয়াল যোগাযোগ—

ধৈর্য কমায়,রাগ বাড়ায়,সহনশীলতা কমায়,আবেগ নিয়ন্ত্রণ দুর্বল করে
,যা পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি করে।

৫. ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের গুরুত্ব

রাসূল ﷺ বলেছেন—

«تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ»

অর্থ: “তোমার ভাইয়ের মুখে হাসিমুখে তাকানোও সদকা।”

(তিরমিজি)

এটি বুঝিয়ে দেয়—

মুখোমুখি যোগাযোগ মানুষের হৃদয় একত্র করে।
প্রযুক্তি সেই জায়গাটিতেই আঘাত দিচ্ছে।

সাইবার বুলিং ও অনলাইন হ্যারেসমেন্ট (Cyberbullying & Online Harassment)
সাইবার বুলিং হলো প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাউকে মানসিকভাবে আঘাত করা, অপমান করা, হুমকি দেওয়া বা ব্ল্যাকমেইল করা। এটি আধুনিক সমাজের এক ভয়াবহ সমস্যা এবং বিশেষত শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশের জন্য একটি বড় বিপদ।

১. সাইবার বুলিংয়ের বিভিন্ন রূপ

সাইবার বুলিং শুধু গালাগালি বা ট্রলিং নয়; এর অন্তর্ভুক্ত—

ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া, ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে অপমান করা, ব্ল্যাকমেইল, গোপনে নজরদারি (Cyber Stalking), ক্রমাগত বিরক্ত করা, হুমকি দেওয়া, গুজব ছড়ানো

২. কেন এটি এত ভয়াবহ?

কারণ—

মানুষকে প্রকাশ্যে অপমান করা খুব সহজ, অপরাধীকে চিহ্নিত করা কঠিন, ২৪ ঘণ্টা যেকোনো স্থানে হয়রানি সম্ভব, এটি দ্রুত ভাইরাল হয়, ভুক্তভোগী একা হয়ে পড়ে, লজ্জায় কেউ কাউকে জানায় না।

ভার্চুয়াল আক্রমণের মানসিক প্রভাব সরাসরি বাস্তব জীবনে পড়ে। সাইবার বুলিংয়ের ফলে হতাশা, আত্মহত্যা, আত্মঘাণ এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ভয়াবহভাবে বাড়ছে।

৩. শিশু-কিশোরদের মানসিক ক্ষতি

গবেষণা বলছে—

৬০% কিশোর জীবনে অন্তত একবার সাইবার বুলিংয়ের শিকার, ৩০% শিশু নিরব থেকে মানসিক রোগে ভোগে, বুলিংয়ের কারণে শিক্ষাগত ফলাফল কমে যায়, আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়

৪. সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো সাইবার বুলিংয়ের কেন্দ্র

ফেসবুক, টিকটক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ—এগুলোতে ভয়ানক মাত্রায়—

ট্রলিং,অপমানজনক কमेंট ও
কনটেন্ট তৈরি করে কাউকে হেয় করা
যা সামাজিক পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলছে।

৫. নারীদের প্রতি ডিজিটাল নির্যাতন
মেয়ে বা মহিলারা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত—

ছবি বা ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া,ব্ল্যাকমেইল,কল রেকর্ড করে হুমকি,অ্যাকাউন্ট হ্যাক,কু-
প্রস্তাব,অপমান

এগুলো তাদের মানসিক শান্তি, নিরাপত্তা এবং সামাজিক জীবনকে ধ্বংস করে দেয়।

৬. ইসলামের দৃষ্টিতে অপমান ও কষ্ট দেওয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ﴾

অর্থ: "তোমরা কাউকে কটু উপাধিতে ডাকো না" (সূরা হুজরাত: ১১)

রাসূল ﷺ বলেছেন—

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»

অর্থ: “মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।” (বুখারি)

সাইবার বুলিং শারীরিক আঘাতের চেয়ে ভয়াবহ, কারণ এটি হৃদয়ের ক্ষত তৈরি করে।

সামাজিক বিচ্ছিন্নতা (Social Isolation):

প্রযুক্তির অতি-ব্যবহারের সবচেয়ে অদৃশ্য কিন্তু গভীর ক্ষতি হলো সামাজিক বিচ্ছিন্নতা।

মানুষের বন্ধুত্ব, সম্পর্ক, আত্মীয়তা, প্রতিবেশিত্ব—সবকিছু আজ হারিয়ে যাচ্ছে।

১. স্ক্রিন টাইম সামাজিক জীবন কমিয়ে দিচ্ছে

দিনে কয়েক ঘণ্টা ফোন ব্যবহারের ফলে মানুষের—

বাস্তব মিলনমেলা,বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটানো,আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়া,প্রতিবেশীদের সাথে
সম্পর্ক,সব কমে গেছে।

২. ভার্চুয়াল বন্ধু = বাস্তব জীবনে একা মানুষ

মানুষ এখন হাজার হাজার "অনলাইন বন্ধু" রাখে, কিন্তু মানসিক কষ্টে পাশে থাকার মতো কেউ নেই।

এই অবস্থাকে মনস্তত্ত্বে বলা হয়—

“Lonely in the crowd”

অর্থাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকেও নির্জনতা।

৩. পরিবারে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা

একই ঘরে থেকেও—

স্বামী মোবাইলে, স্ত্রী মোবাইলে, সন্তান গেমসে,

কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না।

এটি মাইক্রো-আইসোলেশন নামে পরিচিত।

৪. শিশুদের সামাজিক স্কিল ধ্বংস

শিশুরা—

বন্ধু বানাতে পারছে না, ভিড়ে কথা বলতে পারে না, বাস্তব খেলাধুলায় অস্বস্তি বোধ

করে, “Social Anxiety” তৈরি হচ্ছে

এর কারণ: শিশুরা ছোট থেকেই স্ক্রিনে আটকে যায়।

৫. মায়োপিয়া, ডিপ্রেসন, একাকীত্ব—সব মিলিয়ে সামাজিক ভেঙে যাওয়া

প্রযুক্তির কারণে—

.মানুষ ঘর থেকে বের হয় না

.মসজিদে আসে না

.সামাজিক অনুষ্ঠান হয় না

.আত্মীয়তার বন্ধন কমে যায়

ইসলাম সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে সামাজিক সম্প্রীতি ও প্রতিবেশীর হক রক্ষায়।

৬. ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিকতা

রাসূল ﷺ বলেন—

«المؤمنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ»

অর্থ: “মানুষের সাথে মিশে যারা তাদের কষ্ট সহ্য করে, সে একা থাকার চেয়ে উত্তম।”
(তিরমিজি)

আজ প্রযুক্তি সেই সামাজিকতা ধ্বংস করছে।

৫.৫ সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ওপর প্রযুক্তির আগ্রাসন
প্রযুক্তি শুধু সম্পর্কেই নষ্ট করেনি, বরং সংস্কৃতি, নৈতিকতা, শালীনতা, ধর্মীয় চেতনা,
পারিবারিক মূল্যবোধ—সবকিছুকে আঘাত করেছে।

১. পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসন

টিকটক, ইউটিউব, নেটফ্লিক্স, ওয়েব সিরিজ—

এসবের মাধ্যমে পশ্চিমা—

.পোশাক

.জীবনধারা

.যৌন স্বাধীনতা

.নারীবাদ

.সম্পর্ক নীতি

.ভাষা

.অশ্লীলতা

কঠোরভাবে আমাদের সমাজে ঢুকে পড়ছে।

২. লজ্জা-শালীনতার পতন

মেয়েরা ও ছেলেরা—

.উন্মুক্ত পোশাক

.নাচ

.শরীর প্রদর্শন

.রিলস ও শর্ট

তৈরি করেছে শুধু লাইক ও অনুসারী বাড়ানোর জন্য।

এই বিষয়টি ইসলামের মৌলিক নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

আল্লাহ বলেন—

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾

(সূরা নূর: ৩১)

৩. পারিবারিক মূল্যবোধ নষ্ট

.বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান কমে গেছে
.বাবা-মার কথা অমান্য
.সন্তানের অবাধ আচরণ
.সম্পর্কের সম্মান হারানো
এসব প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত প্রভাব।

৪. ভাষার অবক্ষয়

সোশ্যাল মিডিয়া মানুষের—

.অশালীন ভাষা
.সংক্ষিপ্ত, বিকৃত ভাষা
.গালি
.অপমানজনক শব্দ
.বাড়িয়ে দিয়েছে।
এটি সমাজের মূল শালীনতা ধ্বংস করে।

৫. ধর্মীয় অনুশাসন দুর্বল হওয়া

প্রযুক্তির কারণে—
.নামাজ ভুলে যাওয়া
.কুরআন পাঠ কমে যাওয়া
.জিকির-দোয়া হারিয়ে যাওয়া
.অশ্লীলতা বৃদ্ধি
সরাসরি দেখা যাচ্ছে।

৬. প্রযুক্তি-নির্ভর জীবন = সাংস্কৃতিক পরাজয়

যে জাতি অন্যের সংস্কৃতিতে ডুবে যায়, তারা নিজেদের পরিচয় হারিয়ে ফেলে।

ইসলাম বলে—

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»

অর্থ: "যে কোনো জাতির অনুকরণ করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"

(আবু দাউদ)

আজ প্রযুক্তি আমাদের অনুকরণকে বাধ্যতামূলক করে ফেলছে।

শিশু ও কিশোরদের ওপর প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব

আধুনিক প্রযুক্তি যেভাবে শিশু ও কিশোরদের জ্ঞানার্জন, যোগাযোগ ও বিনোদনের নতুন সুযোগ তৈরি করেছে, একইভাবে তাদের মনস্তাত্ত্বিক, আচরণগত, শারীরিক ও নৈতিক বিকাশকে গুরুতরভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে। বর্তমান প্রজন্ম প্রযুক্তির ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল এবং তাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যেও রয়েছে। এই অধ্যায়ে প্রযুক্তির চারটি বড় নেতিবাচক দিক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো

শিশুদের মানসিক বিকাশে স্ক্রিন টাইমের প্রভাব:

শিশুর মানসিক বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো ০-১২ বছর বয়স, এই সময়ে শিশুর মস্তিষ্কে নিউরন সংযোগ দ্রুত গঠিত হয়, ভাষা শেখে, আবেগ বোঝে, আচরণ তৈরি হয় এবং সামাজিক দক্ষতা গড়ে ওঠে, অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম এই স্বাভাবিক বিকাশকে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। স্ক্রিনের সামনে বেশি সময় কাটালে শিশুর শব্দ শেখার গতি কমে যায়, বাক্য গঠন দুর্বল হয়, বাস্তব ভাষা চর্চা কমে যায়, যোগাযোগের দক্ষতা কমে যায়, অভিভাবকের সাথে কথা বলার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। স্মার্টফোন ও কার্টুন শিশুর আবেগগত বিকাশকে নষ্ট করে, রেগে যাওয়া, উত্তেজনা, অস্থিরতা, কান্না নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা, সামান্য বিষয়ে হতাশা দেখা দেয়, আগে যেখানে শিশুদের শান্ত করা যেত আলাপ বা খেলাধুলার মাধ্যমে, এখন অনেক অভিভাবক শিশুকে শান্ত রাখতে মোবাইল দিয়ে থাকে, যা শিশুর স্বাভাবিক আবেগ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। দ্রুতগতির ভিডিও, রঙিন অ্যানিমেশন, আকর্ষণীয় শব্দ শিশুর মস্তিষ্কে বেশি ডোপামিন সৃষ্টি করে এবং বাস্তব জীবনের তুলনামূলক ধীর গতি শিশুকে বিরক্ত করে, ফলে পড়াশোনায় মনোযোগ কমে যায়, ধৈর্য কমে যায়, বাস্তব কাজে আগ্রহ কমে যায়। স্ক্রিন টাইম বেশি হলে শিশু অন্য শিশুদের সাথে খেলতে চায় না, চোখে চোখ রেখে কথা বলতে অসুবিধা হয়, শিষ্টাচার শেখা কমে যায়, পারিবারিক সংযোগ দুর্বল হয়। এছাড়া স্থূলতা, ঘুমের ব্যাঘাত, দেহভঙ্গির সমস্যা, চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া এসব দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব দেখা দেয়।

ভিডিও গেম আসক্তি ও সহিংস আচরণ:

ভিডিও গেম শিশু ও কিশোরদের আচরণ, অনুভূতি এবং চিন্তাশক্তিকে মারাত্মকভাবে পরিবর্তন করে। গেমিং আসক্তির লক্ষণ হলো পড়াশোনায় অনীহা, পরিবারের সাথে আলাপ এড়ানো,

গেম ছাড়া কোনো কাজে মন না বসা, সময় ভুলে যাওয়া, খাবার ভুলে যাওয়া বা অনিয়মিত হওয়া, রাতজাগা, রাগান্বিত হওয়া এবং স্কুলে অনুপস্থিতি। সহিংস গেম শিশুদের আচরণে প্রভাব ফেলে, তারা বেশি আক্রমণাত্মক হয়, মারামারি প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, ধৈর্য কমে যায়, সমস্যা সমাধানে সহিংসতা ব্যবহার করে, বাস্তব জীবনেও সহিংসতা গ্রহণযোগ্য মনে হয়। দীর্ঘ সময় গেম খেলা মস্তিষ্কে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, বাস্তব জীবনের সমস্যা গেমের মতো সহজ মনে হয়, দায়িত্ববোধ কমে যায়, আত্মসম্মানবোধ নষ্ট হয়, পরিবার থেকে দূরে সরে যায়। শারীরিক ক্ষতির মধ্যে মাথাব্যথা, অতিরিক্ত উত্তেজনা, দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি, মেরুদণ্ডের সমস্যা, হাতের ব্যথা, স্থূলতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অনলাইন শিক্ষার আড়ালে প্রযুক্তির অপব্যবহার:

অনলাইন ক্লাস শিশুদের জন্য যেমন সুবিধা এনেছে, তেমনি অসংখ্য অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি করেছে। অনলাইন শিক্ষায় মনোযোগ হ্রাস পেয়েছে, শিশুরা পড়ার ভান করে গেম খেলে, ইউটিউব দেখে, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে, বন্ধুদের সাথে চ্যাট করে, যা অভিভাবক সহজে বুঝতে পারেন না। অনলাইনে প্রতারণা ও নকল প্রবণতা বেড়ে গেছে, যেমন উত্তর গুগল করে পাওয়া, বন্ধুদের থেকে ফ্রিনশট নেওয়া, AI-এর সাহায্যে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করা, যা শিশুদের নৈতিক বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। অনলাইন শিক্ষা শিশুদের একাকীত্ব বৃদ্ধি করেছে, স্কুলের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, সামাজিক দক্ষতা কমাচ্ছে, বাস্তব বন্ধুদের সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছে। অনলাইন ক্লাসের অজুহাতে টিকটক, ফেসবুক, গেম, কার্টুন, অশ্লীল কনটেন্ট দেখার ঝুঁকি অনেক বেশি, অনেক কিশোর-কিশোরী ফেক আইডি খুলে অপরিচিতদের সাথে সম্পর্ক গড়ে, গোপন চ্যাটিং করে এবং ইন্টারনেটে ছবি শেয়ার করে, যা বড় অপরাধের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

কিশোর অপরাধ ও ডার্ক ওয়েবের হাতছানি:

কিশোররা প্রযুক্তির সবচেয়ে বেশি ব্যবহারকারী এবং সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। কিশোর অপরাধের নতুন ধরন হলো হ্যাকিং, ফেসবুক হ্যাক, ব্ল্যাকমেইলিং, সাইবার বুলিং, টাকা আদায়, গেমের আইডি চুরি, ফেক ভিডিও তৈরি, ভয়েস ক্লোনিং, প্রতারণা। ডার্ক ওয়েব একটি গোপন ইন্টারনেট জগৎ, যেখানে মাদক, অস্ত্র, নকল ডকুমেন্ট, সাইবার ক্রাইম টুল, অশ্লীল কনটেন্ট সহজে পাওয়া যায়। কিশোরদের কৌতূহল তাদের ডার্ক ওয়েবে নিয়ে যেতে পারে, অপরাধ চক্রের নিয়োগের শিকার হতে পারে, ব্ল্যাকমেইলিংয়ের শিকার হতে পারে,

ব্যক্তিগত তথ্য চুরি হতে পারে, ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অনলাইন চ্যালেঞ্জ যেমন বু হোয়েল, মোমো, বিপজ্জনক ভিডিও চ্যালেঞ্জ কিশোরদের মানসিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং আত্মহত্যা পর্যন্ত ঘটায়। প্রযুক্তির হাত ধরে কিশোরদের নৈতিক মূল্যবোধ নষ্ট হচ্ছে, পর্নোগ্রাফি আসক্তি, প্রেম-সম্পর্ক, সিক্রেট চ্যাটিং, অশ্লীল ভিডিও শেয়ার, পরিবারকে প্রতারণা করার মতো ঝুঁকি বাড়ছে।

সাইবার নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত তথ্যের ঝুঁকি

বর্তমান যুগে প্রযুক্তির অগ্রগতি আমাদের জীবনকে অনেক সহজ করেছে, তবে এর সঙ্গে এসেছে নতুন ধরনের ঝুঁকি যা ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পুরো সমাজের জন্য বিপজ্জনক। আধুনিক সমাজে সাইবার নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা প্রায় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে তথ্য চুরি, অনলাইন জালিয়াতি, প্রাইভেসি লঙ্ঘন এবং ডিজিটাল প্রতারণার ঝুঁকি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা, হ্যাকিং ও ফিশিং, সার্ভিলেন্স ক্যাপিটালিজম এবং ডিপ ফেক প্রযুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। ৭.১ ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা (Data Privacy) চুরি

প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন সুবিধা দিচ্ছে, তেমনি এটি ব্যক্তিগত তথ্য চুরির জন্য এক বিশাল সুযোগ তৈরি করেছে। প্রতিটি স্মার্টফোন, কম্পিউটার এবং অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে, যা প্রায়শই ব্যবহারকারীর অনুমতি ছাড়া তৃতীয় পক্ষের কাছে পৌঁছে যায়। ব্যক্তিগত তথ্যের মধ্যে রয়েছে নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখ, ফোন নম্বর, ব্যাংক একাউন্টের তথ্য, স্বাস্থ্য তথ্য, অনলাইন চ্যাট, অবস্থান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কার্যকলাপ, ক্রেডিট কার্ড তথ্য এবং অন্যান্য সংবেদনশীল তথ্য। প্রযুক্তির অপব্যবহারকারী ব্যক্তি বা গ্রুপ সহজেই এই তথ্য চুরি করে অর্থনৈতিক ক্ষতি, পরিচয় চুরি, অনলাইন প্রতারণা বা সামাজিকভাবে প্রভাবিত করার জন্য ব্যবহার করতে পারে। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য এনক্রিপশন, শক্তিশালী পাসওয়ার্ড, দুই-ধাপ যাচাইকরণ এবং নিয়মিত সাইবার সচেতনতা অপরিহার্য। ইসলাম ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে, আল্লাহ বলেন: গুরুত্ব দিয়েছে, আল্লাহ বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾

অর্থ: “হে মুমিনগণ, একে অপরের গোপনতা অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না।” (সূরা হুজুরাত, ৪৯:১২)

রাসূল ﷺ বলেছেন:

«لا يدخل الجنة نام»

অর্থ: “যে ঘনঘন অন্যের গোপনীয়তা প্রকাশ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।” (সহিহ মুসলিম)

এই আধ্যাত্মিক দিক থেকে বোঝা যায় যে তথ্যের নিরাপত্তা শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত নয়, নৈতিকভাবে ও ঈমানের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।

হ্যাকিং, ফিশিং এবং অনলাইন জালিয়াতি:

হ্যাকিং হলো কোনো কম্পিউটার সিস্টেমে অনধিকার প্রবেশ করা, যা ব্যক্তিগত তথ্য, সরকারি ডাটাবেস বা সংস্থার তথ্য চুরি বা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে করা হয়। ফিশিং হলো ইমেইল, SMS বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য আদায় করার একটি প্রতারণামূলক প্রক্রিয়া, যা অনেক সময় ব্যাংকিং তথ্য বা ক্রেডিট কার্ডের তথ্য চুরি করতে ব্যবহৃত হয়। অনলাইন জালিয়াতির মধ্যে রয়েছে ফেক ওয়েবসাইট, ভুয়া লেনদেন, নকল অ্যাপ্লিকেশন, সাইবার ব্ল্যাকমেইল এবং পরিচয় চুরি। এই সব কর্মকাণ্ড শিশু, কিশোর, যুবক এবং বৃদ্ধ সকলকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে। প্রতিদিন লক্ষাধিক ব্যবহারকারী ফিশিং এবং হ্যাকিংয়ের শিকার হচ্ছে, যার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষতি, মানসিক চাপ এবং সামাজিকসম্মানহানি হচ্ছে। সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত পাসওয়ার্ড পরিবর্তন, দ্বি-স্তরীয় যাচাইকরণ, অজানা লিঙ্কে ক্লিক না করা, অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার ব্যবহার, নিরাপদ নেটওয়ার্ক এবং সাইবার সচেতনতা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য।

সার্ভিলেন্স ক্যাপিটালিজম: (আমরা যখন পণ্য)

সার্ভিলেন্স ক্যাপিটালিজম হলো একটি প্রক্রিয়া যেখানে ব্যবহারকারীর অনলাইন কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং সেই তথ্য বিক্রি বা বিজ্ঞাপন এবং বিপণনের জন্য ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ ব্যবহারকারীরা নিজেও সচেতন নয় যে তারা পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সার্চ ইঞ্জিন এবং বিনোদন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীর প্রতিটি ক্লিক, সার্চ, অবস্থান এবং পছন্দ রেকর্ড করে, যা বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে বিক্রি হয়। এই তথ্যের অপব্যবহার ঘটলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং গোপনীয়তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যবহারকারীরা লক্ষ্য করে না, তাদের আচরণ এবং সিদ্ধান্ত ডিজিটাল মার্কেটিং দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিশু ও কিশোরদের এই প্রক্রিয়া আরও ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ তারা সহজেই প্রভাবিত হয় এবং নিজের তথ্য নিরাপদ রাখতে সচেতন নয়। ডিপ ফেক (Deep Fake) প্রযুক্তি ও বিভ্রান্তি ছড়ানো

ডিপ ফেক হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে কোনো ব্যক্তির চেহারা বা কণ্ঠ অনলাইনে পরিবর্তন করে এমন ভিডিও বা ছবি তৈরি করা, যা সত্যের সঙ্গে মিলে যায়। এটি রাজনৈতিক প্রপাগান্ডা, পরিচয় চুরি, মানহানি, জাল খবর এবং সামাজিক বিভ্রান্তি ছড়াতে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ ব্যবহারকারীরা সহজেই বিভ্রান্ত হয় এবং সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিলিয়ে বোঝে না। ডিপ ফেকের মাধ্যমে সামাজিক অস্থিরতা, অপপ্রচার এবং মানসিক বিভ্রান্তি বাড়ানো

যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবার, সরকারি সংস্থা এবং মিডিয়া প্রতিষ্ঠানকেও এই প্রযুক্তি মোকাবেলায় সতর্ক থাকতে হয়। প্রযুক্তিগত সমাধান যেমন AI-ভিত্তিক ডিপ ফেক শনাক্তকরণ সফটওয়্যার এবং নৈতিক শিক্ষা অপরিহার্য।

সারসংক্ষেপ:

সাইবার নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত তথ্যের ঝুঁকি আধুনিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে একটি। ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা, হ্যাকিং, ফিশিং ও অনলাইন প্রতারণা প্রতিরোধ, সার্বভৌম ক্যাপিটালিজম বোঝা এবং ডিপ ফেকের দ্বারা বিভ্রান্তি রোধ করা—সবই প্রয়োজন। প্রযুক্তি নিরাপদভাবে ব্যবহার করতে শিক্ষাগত, নৈতিক এবং আইনি দিক থেকে সতর্কতা জরুরি, বিশেষ করে শিশু ও কিশোরদের জন্য। ইসলামও তথ্যের গোপনীয়তা, সততা ও অন্যের অধিকার রক্ষার গুরুত্ব আরোপ করেছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence বা AI) আধুনিক প্রযুক্তির সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান ক্ষেত্র, যা শিল্প, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, যোগাযোগ, বিনোদন এবং সরকারের বিভিন্ন সেবা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করেছে, তবে একই সঙ্গে নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকির সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে কর্মসংস্থান, মানবিক সৃজনশীলতা, নৈতিকতা এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দিক থেকে। এই অধ্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অটোমেশন, বেকারত্ব, মানবিক সৃজনশীলতা ও রোবোটিক্স নীতিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

অটোমেশন এবং বেকারত্বের ঝুঁকি:

অটোমেশন হলো মেশিন বা সফটওয়্যারকে মানুষের কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করা, যা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে, খরচ কমায়, তবে একই সঙ্গে বহু মানুষের কাজকে বিপন্ন করে। শিল্পক্ষেত্রে রোবটের ব্যবহার, ব্যাংকিং এবং প্রশাসনে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াকরণ, সাপ্লাই চেইনে অটোমেশন এবং স্বয়ংক্রিয় কাস্টমার সার্ভিস—এসব কারণে প্রচুর জনসংখ্যার কর্মসংস্থান হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষ করে নিম্ন-দক্ষতা সম্পন্ন শ্রমিক, ডেটা এন্ট্রি, কল সেন্টার, উৎপাদন এবং পুনরাবৃত্তিমূলক কাজের ক্ষেত্রে বেকারত্বের ঝুঁকি বেশি। গবেষণায় দেখা গেছে, ভবিষ্যতের দশকে বিশ্বের ৩০%-৫০% সাধারণ কর্মসংস্থান AI ও অটোমেশনের দ্বারা প্রভাবিত হবে। এর ফলে সামাজিক অসাম্য বৃদ্ধি, মানসিক চাপ, আর্থিক নিরাপত্তার অভাব এবং পরিবার ও সমাজে অসামঞ্জস্য দেখা দিতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI):

মানুষের নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয় AI-এর দ্রুতবর্ধমান ক্ষমতা মানুষের জন্য একটি ভয়ংকর সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে, যেখানে মেশিন বা সফটওয়্যার মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম, নির্ধারিত অ্যালগরিদম, সেন্সর ও ডেটা বিশ্লেষণ প্রযুক্তি এমনভাবে কাজ করেছে যে, মানবিক তত্ত্বাবধানের সীমা অতিক্রম করা সহজ। স্বয়ংক্রিয় ড্রোন, সেন্সরযুক্ত সেন্সর সিস্টেম, AI-ভিত্তিক নিরাপত্তা এবং স্বচালিত যানবাহন—এসব ক্ষেত্রেই মানব নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পাচ্ছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে ভুল সিদ্ধান্ত, তথ্যের অপব্যবহার এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধ এবং নৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় না থাকলে, AI-এর দমনশক্তি সমাজ এবং মানুষের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

মানবিক সৃজনশীলতার ওপর যন্ত্রের প্রভাব:

AI-এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেখা, চিত্র, সঙ্গীত, ভিডিও এবং অন্যান্য সৃজনশীল কাজ তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। এটি মানবিক সৃজনশীলতা এবং কর্মসংস্থানকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। ডিজিটাল আর্টিফিশিয়াল মিউজিক, প্রেডিক্টিভ মডেল, অটোমেটেড রিপোর্ট এবং জেনারেটিভ AI প্রায়শই মানুষের সৃজনশীল প্রক্রিয়ার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে মানুষের স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনা, আবেগ এবং নান্দনিক দিকের গুরুত্ব কমে যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে মানবিক সৃজনশীলতা হ্রাস পেতে পারে এবং মানুষ কেবল AI-এর সাপোর্ট হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হতে পারে। এর ফলে সৃজনশীল পেশার প্রাপ্যতা, মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এবং নতুন প্রজন্মের জন্য স্বাধীন চিন্তার সুযোগ সীমিত হবে।

রোবোটিক্স এথিক্স বা নীতিমালার অভাব:

রোবোটিক্স এবং AI-এর নৈতিক নীতি এখনও অপ্রতুল, যা প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি সৃষ্টি করে। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, সেন্সরযুক্ত নজরদারি সিস্টেম, স্বচালিত যানবাহন, স্বাস্থ্য সেবা রোবট, মানবসদৃশ রোবট—এসব ক্ষেত্রে নৈতিক নিয়ন্ত্রণ অপরিপূর্ণ। AI-এর সিদ্ধান্ত মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক বিবেচনা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বাইরে চলে যেতে পারে। বিশেষ করে স্বায়ত্তশাসিত সেন্সর সিস্টেমে মানবিক জীবনের মূল্যায়ন, গোপনীয়তা এবং ন্যায্যতার অভাব দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গেছে, রোবোটিক্সের নৈতিক নীতি তৈরি না হলে, প্রযুক্তির অপ্রত্যাশিত ব্যবহার মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায় এবং নিরাপত্তাকে হুমকিতে ফেলতে পারে।

সারসংক্ষেপ:

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের জীবনকে সহজ, দ্রুত এবং কার্যকর করেছে, তবে এর সঙ্গে এসেছে কর্মসংস্থান হ্রাস, মানুষের নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয়, মানবিক সৃজনশীলতার ক্ষয় এবং নৈতিক নিয়ন্ত্রণের অভাব। AI এবং রোবোটিক্সের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে নৈতিক নীতি, আইন, শিক্ষাগত প্রচেষ্টা এবং সামাজিক সচেতনতা অপরিহার্য। প্রযুক্তি ব্যবহার কখনোই মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করা উচিত নয়, বরং এটি মানব উন্নয়ন, নৈতিকতা এবং সামাজিক কল্যাণের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হবে।

পরিবেশ গত বিপর্যয়:

প্রযুক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজ, দ্রুত এবং কার্যকর করে তুলেছে, তবে এই অগ্রগতির সঙ্গে পরিবেশগত ঝুঁকি ও বিপর্যয়ও এসেছে। ডিজিটাল যুগে ই-বর্জ্য, ডাটা সেন্টার ও বিদ্যুৎ খরচ, প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের অব্যবস্থাপনা—এসব দিক পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। আধুনিক সমাজে প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পরিবেশে যে ক্ষতি হচ্ছে, তা শুধু বর্তমান প্রজন্মকেই নয়, ভবিষ্যতের প্রজন্মকেও প্রভাবিত করবে। এই অধ্যায়ে আমরা ই-বর্জ্য, ডাটা সেন্টারের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ খরচ এবং প্রযুক্তি উৎপাদনে প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয়কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

ই-বর্জ্য (E-Waste): একটি বৈশ্বিক হুমকি:

ই-বর্জ্য হলো ব্যবহৃত বা অপ্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক্স, যেমন স্মার্টফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, টিভি, প্রিন্টার, চার্জার, ব্যাটারি এবং অন্যান্য ছোট-বড় প্রযুক্তিপণ্য, যা নিষ্পত্তি না হলে পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যকে বিপদে ফেলে। বৈশ্বিকভাবে প্রতি বছর প্রায় ৫০ মিলিয়ন টন ই-বর্জ্য উৎপন্ন হয় এবং এর পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ই-বর্জ্যের মধ্যে ভারী ধাতু, সিসা, পারদ, কাদমিয়াম, ক্রোমিয়াম এবং প্লাস্টিক থাকে, যা মাটি, পানি এবং বায়ু দূষিত করে। এই পদার্থগুলি বিষাক্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী, যা কৃষি জমি নষ্ট করে, পানির উৎস দূষিত করে এবং মানবদেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। অনেক দেশে ই-বর্জ্য নিয়মিতভাবে রিসাইকেল করা হয় না, ফলে কাঁচামাল পুনঃব্যবহার হয় না এবং পরিবেশে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ই-বর্জ্য নিষ্পত্তির জন্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যেমন ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট আলাদা করা, পুনঃব্যবহারযোগ্য উপাদান সংগ্রহ এবং বিপজ্জনক পদার্থ সুরক্ষিতভাবে ধ্বংস করা জরুরি।

ইসলামে পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত, আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾

অর্থ: “পৃথিবীতে যা ঠিক আছে তা নষ্ট করো না।” (সূরা আরাফ, ৭:৫৬)

রাসূল ﷺ বলেছেন:

«لا ضرر ولا ضرار»

অর্থ: “কোনও ক্ষতি নেই এবং ক্ষতি করা চলবে না।” (সহিহ বুখারি)

এই আয়াত ও হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, প্রযুক্তির অযথা ব্যবহার ও ই-বর্জ্য অব্যবস্থাপনা পরিবেশের জন্য নৈতিকভাবেও গ্রহণযোগ্য নয়। ডাটা সেন্টার ও অতিরিক্ত বিদ্যুৎ খরচ

ডাটা সেন্টার হলো অনলাইন তথ্য, ক্লাউড সার্ভিস এবং ইন্টারনেট কার্যক্রম সংরক্ষণের জন্য স্থাপন করা বড় বড় কম্পিউটার সুবিধা। বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে ডাটা সেন্টারের সংখ্যা এবং ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ডাটা সেন্টারগুলো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সার্ভার, কুলিং সিস্টেম এবং নেটওয়ার্ক ডিভাইস ব্যবহার করে, যা প্রচুর বিদ্যুৎ খরচ করে। একটি বড় ডাটা সেন্টার বছরে প্রায় ১০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টার বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারে, যা শক্তি উৎপাদনের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর দেশে কার্বন নির্গমন বাড়ায়। কার্বন নির্গমন বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাসের মাত্রা বাড়ায়, যা জলবায়ু পরিবর্তন, তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। এছাড়া ডাটা সেন্টারের জন্য নির্ধারিত জমি ও পানি ব্যবস্থাপনাও পরিবেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এই কারণে প্রযুক্তি ব্যবহার শুধু সুবিধা নয়, পরিবেশগত দিক থেকেও গুরুতর প্রতিকূলতা তৈরি করছে।

প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদনে প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশ:

স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, টেলিভিশন, রোবট এবং অন্যান্য প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদনের জন্য বড় পরিমাণে কাঁচামাল প্রয়োজন, যেমন তামা, লিথিয়াম, কোবাল্ট, সোনা, রিনিয়াম, প্ল্যাটিনাম এবং অন্যান্য মূল্যবান খনিজ। এই খনিজ সম্পদগুলি প্রাকৃতিক খনিজ খনিতে খনন করা হয়, যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক। খনি থেকে ভূমি ক্ষয়, বনভূমি ধ্বংস, মাটির ক্ষয়, নদীর জল দূষণ এবং বন্যপ্রাণীর বাসস্থান ধ্বংস হয়। এছাড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার এবং কার্বন নির্গমন পরিবেশে অতি ক্ষতি করে। বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিপণ্য দ্রুত পরিবর্তনের কারণে পুরাতন পণ্য দ্রুত ফেলে দেওয়া হয়, যা পুনঃব্যবহার বা রিসাইক্লিং সঠিকভাবে না হওয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদের অব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি পায়। এভাবে, প্রযুক্তি অগ্রগতি মানবসৃষ্ট সুবিধা এনেছে, কিন্তু একই সঙ্গে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে, যাপরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে, যা দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব এবং পরিবেশগত স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি তৈরি করছে।

সারসংক্ষেপ:

পরিবেশগত দিক থেকে প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব অত্যন্ত গভীর। ই-বর্জ্য পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যকে হুমকিতে ফেলে, ডাটা সেন্টার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করে এবং কার্বন নির্গমন বাড়ায়, প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদনে প্রাকৃতিক সম্পদের অযথা ব্যবহার পরিবেশকে দূষিত করে এবং বনভূমি, নদী, মাটি ও বন্যপ্রাণীর ওপর চাপ সৃষ্টি করে। প্রযুক্তি ব্যবহারে পরিবেশ রক্ষার নৈতিক ও সামাজিক দিকগুলোও গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের শিক্ষায় পরিবেশ সংরক্ষণ, ক্ষতি

থেকে বিরত থাকা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হয়েছে, যা বর্তমান ডিজিটাল যুগেও প্রযোজ্য।

উত্তরণের উপায় ও সুপারিশমালা

প্রযুক্তির অপব্যবহার প্রতিরোধ এবং মানুষের মানসিক, সামাজিক, পারিবারিক ও শারীরিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য। উত্তরণের জন্য সুপারিশগুলো হলো:

প্রথমত, ডিজিটাল ডিটক্স এবং সচেতনতা বৃদ্ধি অপরিহার্য, যা মানুষের নিজস্ব মন এবং শরীরকে প্রযুক্তি থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মুক্ত রাখে, যেমন নির্দিষ্ট সময়ে ফোন বন্ধ রাখা, সামাজিক মিডিয়া থেকে বিরতি নেওয়া, পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সরাসরি সময় কাটানো, মননশীল কার্যক্রমে মনোনিবেশ করা এবং শারীরিক ব্যায়াম ও প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ রাখা দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তির সুষম ব্যবহার বা ডিজিটাল ওয়েলবিয়িং নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যেখানে প্রযুক্তি ব্যবহারের নিয়ম, সীমাবদ্ধতা এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়, যেমন অনলাইন গেমিং বা ভিডিও দেখার সময় সীমিত রাখা, শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারকে প্রাধান্য দেওয়া, এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে প্রযুক্তি ব্যবহারের মানসিক প্রশিক্ষণ দেওয়া।

তৃতীয়ত, পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ, যেমন অভিভাবকরা শিশু ও কিশোরদের প্রযুক্তি ব্যবহারের সময় ও কন্টেন্ট নিয়ন্ত্রণে রাখবেন, স্কুল ও কলেজে ডিজিটাল আচরণ নীতি প্রণয়ন করা, অনলাইন নিরাপত্তা এবং সামাজিক দক্ষতা শিক্ষা প্রদান, এবং শিশু ও কিশোরদের মধ্যে প্রযুক্তি সচেতনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ বিকাশে সহায়তা করা। চতুর্থত, সরকারি নীতিমালা এবং সাইবার আইন প্রয়োগ অপরিহার্য, যেমন অনলাইন হ্যাকিং, ফিশিং, সাইবার বুলিং, পরিচয় চুরি ও অনলাইন প্রতারণার বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ, ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, ই-বর্জ্য নিষ্পত্তি ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং জনগণকে সচেতন করা।

পঞ্চমত, প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহারের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে দায়িত্বশীলতা, সততা, স্ব-সংযম এবং পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়, যেমন ইসলামের শিক্ষায় উল্লিখিত নৈতিকতা ও সততার মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া, আল্লাহর নির্দেশ ও হাদিস অনুসারে ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রযুক্তির ব্যবহার নির্ধারণ করা, এবং ডিজিটাল ব্যবহারকে মানবকল্যাণ ও

সামাজিক উন্নয়নের সাথে সংযুক্ত করা। এই সুপারিশগুলো মেনে চললে প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব, মানুষকে নৈতিক, মানসিক, শারীরিক ও সামাজিকভাবে সুস্থ রাখা সম্ভব, পরিবার ও সমাজের সম্পর্ক দৃঢ় রাখা যায়, এবং শিশু ও কিশোরদের সঠিক বিকাশ নিশ্চিত করা যায়।

উপসংহার

গবেষণার সারমর্ম থেকে বোঝা যায় যে প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে অসংখ্যভাবে উন্নত করেছে, যেমন যোগাযোগ দ্রুততর হয়েছে, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বাস্থ্যসেবা উন্নত হয়েছে, অর্থনৈতিক কার্যক্রমে স্বয়ংক্রিয়তা এসেছে, এবং দৈনন্দিন কাজগুলো সহজ ও কার্যকর হয়েছে। তবে প্রযুক্তির অপব্যবহার ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার সমাজ, পরিবার, শিশু ও কিশোর, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের ওপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এই থিসিসে প্রযুক্তির ফাঁদ, শারীরিক ও মানসিক প্রভাব, সামাজিক ও পারিবারিক অবক্ষয়, শিশু ও কিশোরদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব, সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব এবং পরিবেশগত ক্ষতি—all detailed বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে প্রযুক্তি শুধুমাত্র সুবিধারউৎস নয়, বরং সচেতন ও নৈতিক ব্যবহার না করলে বিপদও নিয়ে আসে।

প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যেমন অশ্লীল কন্টেন্ট, অনলাইন প্রতারণা, গীবত, চুগলবাজি এবং সামাজিক যোগাযোগের অসংযম সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করছে। ইসলাম নৈতিকতা, সততা, সংযম এবং দায়িত্বশীল ব্যবহারকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾

অর্থ: “পৃথিবীতে যা ঠিক আছে তা নষ্ট করো না।” (সূরা আরাফ, ৭:৫৬)

রাসূল ﷺ বলেছেন:

«لا ضرر ولا ضرار»

অর্থ: “কোনও ক্ষতি নেই এবং ক্ষতি করা চলবে না।” (সহিহ বুখারি)

এই নৈতিক নির্দেশনা প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য আজও প্রযোজ্য এবং মানুষের জন্য একটি গাইডলাইনহিসেবে কাজ করে।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার চোখের ক্ষতি, অনিদ্রা, স্থূলতা, ডিপ্রেসন, একাকীত্ব এবং মানসিক চাপ বাড়াচ্ছে। শিশু ও কিশোররা অনলাইন গেম, ভিডিও এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিরিক্ত সময় ব্যয় করার ফলে মনোযোগ, আচরণ, নৈতিকতা এবং সৃজনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। পরিবার ও পারিবারিক বন্ধনও প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে দুর্বল হচ্ছে, যেমন পরিবারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ কমছে, অভিভাবক-সন্তান সম্পর্ক দুর্বল হচ্ছে, এবং দাম্পত্য জীবনে অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। সাইবার নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত তথ্যের ঝুঁকিও প্রযুক্তির ব্যবহারের সঙ্গে বাড়ছে। হ্যাকিং, ফিশিং, পরিচয় চুরি, ডিপ ফেক, অনলাইন প্রতারণা এবং সাইবার বুলিং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিপদ

তৈরি করছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে মানুষের নিয়ন্ত্রণ হারানোর সম্ভাবনা, অটোমেশন এবং রোবোটিক্সের নৈতিক নিয়ন্ত্রণের অভাব সমাজে কর্মসংস্থান হ্রাস, মানবিক সৃজনশীলতার ক্ষয় এবং নৈতিক দ্বন্দ্ব তৈরি করছে।

পরিবেশগত দিক থেকে প্রযুক্তি ই-বর্জ্য, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ খরচ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অযথা ব্যবহার বৃদ্ধি করেছে। ডাটা সেন্টারগুলো কার্বন নির্গমন বাড়াচ্ছে, খনিজ ও উপকরণের অযথা ব্যবহার বন, নদী ও প্রাকৃতিক বাসস্থান ক্ষয় করছে। এটি জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পরিবেশের ওপর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করছে। উপসংহারে বলা যায়, প্রযুক্তি মানুষের জীবনে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার, যা সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে কল্যাণ এবং উন্নতি দিতে পারে। তবে এর অপব্যবহার মানুষ, সমাজ, শিশু ও কিশোর, পরিবেশ এবং নৈতিক মানসিকতার জন্য বিপদ সৃষ্টি করছে। ভবিষ্যতের জন্য বার্তা হলো, প্রযুক্তি ব্যবহার সর্বদা নৈতিক, পরিমিত, সচেতন এবং কল্যাণমুখী হতে হবে। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকার এবং সমাজকে একত্রিতভাবে কাজ করতে হবে, যাতে ডিজিটাল সচেতনতা, স্ক্রিন টাইম নিয়ন্ত্রণ, ডিজিটাল ওয়েলবিয়িং, শিশু ও কিশোরের সৃজনশীল বিকাশ, সাইবার নিরাপত্তা এবং পরিবেশ সচেতনতা নিশ্চিত করা যায়। প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সহজ করতে পারে, তবে শুধুমাত্র সচেতন ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে। এই থিসিস প্রমাণ করে যে, প্রযুক্তির কল্যাণ এবং ক্ষতি উভয়ই মানুষের হাতে নির্ভরশীল, এবং নৈতিক, সামাজিক, মানসিক এবং পরিবেশগত দিকগুলো বিবেচনা না করলে প্রযুক্তি বিপদ এবং ফিতনার উৎস হয়ে উঠতে পারে। অতএব, প্রযুক্তিকে মানবকল্যাণের সঙ্গে সংযুক্ত করে ব্যবহার করা, নৈতিক শিক্ষা, পরিবারের নিয়ন্ত্রণ, সরকারের নীতিমালা এবং সচেতন সমাজই ভবিষ্যতের স্থায়ী সমাধান।